কিংশুক

ভাগ – 3
শ্রেণি – V

নির্দেশক (প্রাথমিক শিক্ষা), শিক্ষা বিভাগ, বিহার সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ।

সৌজন্যে ঃ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার, পাটনা ।

সর্ব শিক্ষা অভিযান কার্যক্রমের অন্তর্গত
পাঠ্য পুস্তকের নিঃশুল্ক বিতরণ ।
ক্রয় বিক্রয় দণ্ডণীয় অপরাধ ।

© বিহার স্টেট টেক্সট্‌বুক পাবলিশিং কপোরেশন লিমিটেড

বিহার স্টেট টেক্সটবুক পাবলিশিং করপোরেশন লিমিটেড, পাঠ্য পুস্তক ভবন, বুদ্ধ মার্গ, পাটনা - 800 001 দ্বারা প্রকাশিত এবং

প্রস্তাবনা

মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বিহার সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে জুলাই 2007 থেকে বিহার রাজ্যের মাধ্যমিক শ্রেণিগুলির (I - X) জন্য নতুন পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। ভাষা শিক্ষার এই নতুন পাঠ্যক্রমের উপর নির্ভর করে S.C.E.R.T কর্তৃক বিকশিত এবং বিহার রাজ্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন নিগম কর্তৃক প্রচ্ছদ অলঙ্করণ করে মুদ্রিত করা হোল। এই বইটিকে বিহার রাজ্যের পাঠ্য পুস্তক রূপে স্বীকৃত করা হয়েছে।

বিহার রাজ্য বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার (শ্রেণি – I থেকে XII) গুণগত মান বজায় রেখে শিক্ষাকে সার্থক করে তোলার সফল রূপকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নীতিশ কুমার, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী হরি নারায়ণ সিং এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের মুখ্য সচিব শ্রী অঞ্জনী কুমার সিংহ। এঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের প্রত্যাশা এই বইগুলি রাজ্যের বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের জন্য জ্ঞানোপযোগী প্রমাণিত হবে। S.C.E.R.T-র নির্দেশকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস বর্তমান বইটি যুগোপযোগী এবং শিক্ষার্থীদের চেতনার বিকাশে সহায়ক হবে। যদিও বিকাশ ও পরিবর্ধনের যথার্থতা ভবিষ্যতই নিরূপিত করবে তবুও প্রকাশন এবং মুদ্রণে উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রতি দায়বদ্ধ বিহার রাজ্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন নিগম সর্বদাই অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গঠনমূলক পরামর্শ গ্রহণ করতে আগ্রহী। এর ফলে দেশের শিক্ষা জগতে বিহার রাজ্য শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণের অধিকারী হতে পারবে।

হসনৈন আলম
নির্দেশক,
বিহার রাজ্য পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশন নিগম লি.

দিকনির্দেশ

শ্রী হাসান ওয়ারিস – নির্দেশক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ বিহার, পাটনা,
ডা. আবদুল মোইন–বিভাগাধ্যক্ষ, শিক্ষক শিক্ষা বিভাগ, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার, পাটনা।

সংযোজক

ড. স্নেহাশিস দাস – অধ্যাপক, শিক্ষক শিক্ষা বিভাগ, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার পাটনা।

বাংলা ভাষা পাঠ্যপুস্তক বিকাশ সমিতি

পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান (বাংলা) বি.এন. কলেজ, পাটনা
ড. বীথিকা সরকার, শিক্ষক, পাটনা কলেজিয়েট স্কুল, পাটনা
ড. সাধনা রায়, কলেজ অফ কমার্স, পাটনা, মগধ বিশ্ববিদ্যালয়
ড. শুভ্রা চৌধুরী, সহশিক্ষক, রঘুনাথ প্রসাদ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পাটনা
গৌরব দাস বর্মণ, প্রধান শিক্ষক, চৌতরোয়া, পশ্চিম চম্পারণ
শঙ্কর কুমার সরকার, সহশিক্ষক, মধ্য বিদ্যালয়, মঝারিয়া কলোনী, বেতিয়া
শুভলক্ষ্মী লাহিড়ী, সহশিক্ষক, রবীন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়, পাটনা
ড. শামা পারভীন, সহশিক্ষক, রাজকীয় মধ্য বিদ্যালয়, পালি, বিহিটা।

প্রচ্ছদ

শুভেন্দু বিশ্বাস

পাঠ অলঙ্করণ

মৃণাল শীল

সমীক্ষক

ড. গুরুচরণ সামন্ত
অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক (বাংলা বিভাগ), কলেজ অব্ কমার্স, পাটনা।

ড. কল্যাণী গুপ্ত (অধ্যাপিকা)
পি.জি. বিভাগ (বাংলা)
বি.আর.এ আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়, মজঃফরপুর, বিহার।

প্রতিবেদন

নতুন পাঠক্রম অনুসারে পঞ্চম শ্রেণির জন্য এই সংকলনটি প্রকাশিত হোল। বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি ও লেখকদের উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির নির্বাচিত অংশ নিয়ে এই পুস্তকটি রচনা করা হয়েছে। বর্তমান যুগের শিক্ষার্থীদের মনে বাংলা গদ্য ও পদ্যের ধারাবাহিক বিকাশ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট বুনিয়াদী ধারণা গড়ে দেওয়াই বর্তমান সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য। বাংলা ভাষার নানা ধরনের রচনার মধ্য দিয়ে বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছ।

একটা বাধাধরা সময় সীমার মধ্যে পাঠপুস্তক শেষ করে পরীক্ষায় বসতে হয়। এই সীমাবদ্ধতাকে মনে রেখে শিক্ষার্থীদের চেতনার বিকাশের সহায়ক রূপে বইটি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। যে ভাবধারা মতান্ধতা ও অন্য প্রকার প্রগতি বিরোধী সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয় সেই জাতীয় ভাবধারা সম্বলিত লেখা এখানে পরিহার করে সংবেদনশীলতা ও সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক প্রগতিশীল রচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, দেশবরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিশু মনের অহেতুক ভীতি, শিশু মনের কল্পনা, বিজ্ঞান চেতনার বিকাশে সহায়ক লেখাগুলিকে চয়ন করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য একটি পাঠের খানিকটা অংশ পড়ার পর পাঠ্যাংশের সম্ভাবিত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। মূল পাঠের শেষে বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্নগুলি দেওয়া হয়েছে, যার শীর্ষক 'পাঠবোধ'।

বর্তমানে পাঠ্যপুস্তকটিতে যথাসমভব পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত সরল বানান অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কম্পুটরে ছাপার সুবিধার জন্য যুক্তাক্ষরগুলির সরল রূপ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হোল। যেমন রু – রু, রূ–রূ, গু–গু, স্তু – স্তু, ণ্ড – ণ্ড, ন্ধ–ন্ধ, বাড়ী–বাড়ি, পাখী–পাখি, শ্রেণী–শ্রেণি, কাহিনী–কাহিনি ইত্যাদি।

জেনে রেখো, বিশিষ্ট লেখক ও কবিদের সংকলিত পাঠগুলিতে পুরোনো বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বর্তমানে সেই বানানগুলির সরল রূপ 'পাঠ পরিচয়' ও 'পাঠবোধে' দেওয়া হোল। শিক্ষার্থীরা তাদের লেখাতে এই নতুন বানান অনুসরণ করবে।

'কী' এবং 'কি' এর সংশয় দূর করবার জন্য জেনে রাখা প্রয়োজন, কোনো প্রশ্নের উত্তর কেবল 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' হলে 'কি' প্রয়োগ হবে। যেমন–তুমি যাবে কি? উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না'। প্রশ্নের দীর্ঘ উত্তর হলে 'কী' প্রয়োগ হবে। যেমন – তুমি কী খাচ্ছে? উত্তর–চিনেবাদাম খাচ্ছি। এই পার্থক্য বিশদভাবে নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া হয়েছে।

এই পাঠ্যপুস্তকটির নাম 'কিংশুক' রাখা হয়েছে। কুঁড়ি বিকশিত হয়ে পরবর্তী স্তরে ফুলে পরিণত হয়। 'কোরক' যে শিশুদের পাঠ্য তার পরবর্তী স্তর কিংশুক। কিংশুকের অর্থ পলাশ ফুল। পলাশ ফুলের

রঙ উজ্জ্বল লাল। রঙটি জীবনের অফুরন্ত শক্তির দ্যোতক। পলাশ গাছ সাধারণতঃ জন্মায় কঠিন মাটির ওপর। মাটির কঠোরতা তার স্বাভাবিক পরিস্ফূটনে অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে না। আমাদের দেশে শিশুরাও বেড়ে ওঠে প্রতিকূল পরিবেশের বাধাকে অতিক্রম করে। তাদের কথা মনে রেখেই এই বইটির নামকরণ করা হয়েছে।

নব প্রজন্মের নবীন শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে যুগোপযোগী এই বইটি পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলকভাবে রচিত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি সাধনে শিক্ষার্থী ও মাননীয় শিক্ষকগণের গঠনমূলক সৃজনশীল পরামর্শ আমরা অত্যন্ত আনন্দ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করব। না হয়ে পড়ে সেইজন্য শিক্ষকদের যথারীতি যত্নবান হয়ে তাদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশে সাহায্য করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা যাতে কেবলমাত্র মুখস্ত বিদ্যার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে।

বীথিকা সরকার

কোথায় কী আছে

গদ্য

বিষয়		পৃষ্ঠা
১. **সুখ-দুঃখ** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কবিতা	1-6
২. **চোর দরওয়াজা** গজেন্দ্রনাথ মিত্র	ইতিহাসের গল্প	7-14
৩. **ঝড়** মৈত্রেয়ী দেবী	কবিতা	15-18
৪. **জঙ্গলের কত্তারা** জোমো কেনিয়াট্টা	অনুবাদ গল্প	19-28
৫. **হিন্দু-মুসলমান** কাজী নজরুল ইসলাম	কবিতা	29-31
৬. **পৃথিবীর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও নক্ষত্রের সংখ্যা** (গোপাল ভাঁড়ের গল্প)	গল্প	32-37
৭. **আর একটি তারা** অন্নদাশংকর রায়	কবিতা	38-42
৮. **শহীদ-এ-ওয়তন পীর আলি** বিদ্যুৎ পাল	দেশপ্রেম	43-49
৯. **ঠাণ্ডার গল্প** গিরিজা কুমার বসু	কবিতা	50-53
১০. **রাজার মুখ** মীরা বালসুব্রমনিয়ম	গল্প	54-60
১১. **হঠাৎ যদি** প্রেমেন্দ্র মিত্র	কবিতা	61-66
১২. **কমল** রেবন্ত গোস্বামী	গল্প	67-74

বিষয়

পৃষ্ঠা

১৩. **সুলতান**	গল্প	**75–84**
শৈলেন ঘোষ		
১৪. **আমরা ঘাসের ছোট ছোট ফুল**	কবিতা	**85–88**
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র		
১৫. **লেজের কাহিনী**	রচনা	**89–96**
সুকান্ত ভট্টাচার্য্য		
১৬. **পরিবেশ দূষণ**	প্রবন্ধ	**97–101**
১৭. **বটগাছ**	কবিতা	**102–105**
মনীন্দ্র রায়		
১৮. **গুপী গাইন বাঘা বাইন**	নাটক	**106–116**
সত্যজিৎ রায়		
১৯. **চুপি চুপি**	কবিতা	**117–119**
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী		
২০. **ট্যাকসো দিও হাতির**	গল্প	**120–127**
অধীর বিশ্বাস		
২১. **দুপুরে গ্রামের পথ**	কবিতা	**128–131**
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়		
২২. **বিচার**	গল্প	**132–135**
মোহিত রায়		
২৩. **দেওয়াল পত্রিকা**		**136–137**

সুখদুঃখ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বসেছে আজ রথের তলায়
স্নানযাত্রার মেলা।
সকাল থেকে বাদল হল
ফুরিয়ে এল বেলা।
আজকে দিনের মেলামেশা,
যত খুশি, যতই নেশা
সবার চেয়ে আনন্দময়
ওই মেয়েটির হাসি।
এক পয়সায় কিনেছে ও

তালপাতার এক বাঁশি।
বাজে বাঁশি, পাতার বাঁশি
আনন্দস্বরে।
হাজার লোকের হর্ষধ্বনি
সবার উপরে।

ঠাকুরবাড়ি ঠেলাঠেলি
লোকের নাহি শেষ।
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায়
ভেসে যায় রে দেশ।
আজকে দিনের দুঃখ যত
নাই রে দুঃখ উহার মতো,
ওই যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান-পানে চাহি,
একটি রাঙা লাঠি কিনবে
একটি পয়সা নাহি।
চেয়ে আছে নিমেষহারা
নয়ন অরুণ।
হাজার লোকের মেলাটিরে
করেছে করুণ।

জেনে রাখো

রথের তলায় – পুরীর জগন্নাথদেবের রথের আদলে তৈরি রথ বহু শহর ও গ্রামে আছে। বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে রথ টানা হয়। কিন্তু সারা বছর যে জায়গা বা যে মন্দিরের কাছে রথটি রাখা থাকে সেই জায়গার নাম লোকমুখে রথতলা হয়ে যায়।

স্নানযাত্রা – পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরে জৈষ্ঠ্য মাসের পূর্ণিমাতে বছরে একবার স্নানযাত্রার উৎসব পালিত হয়। সেই উৎসবের অনুসরণে বিভিন্ন গ্রামে বা শহরে অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকে। (জেনে রেখো, বারো বছর পরে পরে পুরীর জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এই বিগ্রহগুলি নতুন কলেবরে স্থাপিত হয়)

বাদল – মেঘ

এক পয়সা – কবিগুরু এই কবিতাটি আজ থেকে প্রায় (৩১শে জৈষ্ঠ্য ১৩০৭) ১১১ বছর আগে লিখেছেন। ভেবে দেখো, তখন এক পয়সার মূল্য কতখানি ছিল।

হর্ষধ্বনি – আনন্দধ্বনি

অবিশ্রান্ত – অনবরত

নিমেষহারা – [নিমেষের অর্থ চোখের পাতা ফেলতে যেটুকু সময় লাগে, খুব সামান্য সময়] সামান্য সময়টুকু না হারানো, একভাবে চেয়ে থাকা।

নয়ন – চোখ

অরুণ – গাঢ় লাল রং [ভোরের সূর্যকে অরুণ বলা হয়, সূর্যের সারথির নাম]

নিচের লাইনগুলির অর্থ জেনে রাখো

"চেয়ে আছে নিমেষহারা
নয়ন অরুণ।
হাজার লোকের মেলাটিরে
করেছে করুণ।"

একটি পয়সার অভাবে মনের মতো জিনিস কিনতে না পারার জন্য দুঃখে বেদনায় ছোট ছেলেটির চোখ দুটি লাল হয়ে উঠেছে। সেই জলভরা ছলছল্ চোখে এক দৃষ্টিতে দোকানের দিকে চেয়ে আছে। কবি বলেছেন, ছোট্ট শিশুটির দুঃখ যেন পুরো মেলা প্রাঙ্গনকে বেদনায় ভরে দিয়েছে।

কাব্য পরিচয়

এই কবিতাটিতে কবি সুখ ও দুঃখের দুটি ছবি এঁকেছেন। রথতলায় মেঘলা আকাশের নিচে স্নানযাত্রার মেলা বসেছে। একটি ছোট মেয়ে মেলা থেকে এক পয়সার তালপাতার বাঁশি কেনে। তার সেই বাঁশির সুর ও পাওয়ার আনন্দ যেন মেলা প্রাঙ্গনের সকল আনন্দকে তুচ্ছ করে দেয়।

আর একদিকে এই মেলাতেই ছোট্ট ছেলেটি দোকানে সাজানো রাঙা লাঠির দিকে সজল চোখে চেয়ে থাকে, কারণ তার কাছে একটি পয়সা নেই যে সে ঐ লাঠিটি কিনবে। বৃষ্টিধারায় ভেসে যাওয়া মেলা প্রাঙ্গনকে বেদনায় ভরিয়ে দেয় ঐ ছোট্ট শিশুটির না পাওয়ার বেদনায় জলে ভরা দুটি চোখ।

পাঠবোধ

খালি জায়গাগুলি ঠিক শব্দ দিয়ে ভরো

1. বসেছে আজ.....
   স্নানযাত্রার মেলা। [নদীর ধারে/রথের তলায়]
2. সবার চেয়ে..... [আনন্দময়/বেদনাময়]
   ঐ মেয়েটির..... [ব্যথা/হাসি]

3. ..... লোকের হর্ষধ্বনি। [শত/হাজার]
   সবার..... । [নিচে/উপরে]
4. ..... ঠেলাঠেলি [ঠাকুরবাড়ি/রাজবাড়ি]
   লোকের নাহি শেষ।
5. অবিশ্রান্ত..... [আনন্দধারায়/বৃষ্টিধারায়]
   .....যায় রে দেশ [ভরে/ভেসে]
6. ওই যে ছেলে.....চোখে [করুণ/কাতর]
   ..... পানে চাহি [আকাশ/দোকান]

ঠিক লাইনগুলিতে ✓ চিহ্ন দাও

7. সন্ধ্যে থেকে বৃষ্টি হল
   ফুরিয়ে এল রাত
8. এক পয়সায় কিনেছে ও
   তালপাতার এক বাঁশি
9. আজকে রাতের সুখ যত
   নাই রে সুখ উহার মতো
10. ওই যে ছেলে কাতর চোখে
    দোকান পানে চাহি,

বিস্তারিতভাবে উত্তর দাও

11. সবার চেয়ে আনন্দময় কেন মেয়েটির মুখের হাসি? 'সুখদুঃখ' কবিতাটি পড়ে বুঝিয়ে লেখো।
12. কবি বলেছেন,
    'আজকে দিনের দুঃখ যত
    নাইরে দুঃখ উহার মতো'
    মেলায় ছেলেটির এতো দুঃখ কেন? সুখদুঃখ কবিতাটি পড়ে বুঝিয়ে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বানানগুলি ঠিক করে লেখো

অবিস্রান্ত	আনন্দধনি
করূণ	নিমেসহারা
অরুন	নয়ণ

2. কোনটি বিশেষ্য কোনটি বিশেষণ পদ শব্দগুলির পাশে লেখো।

ভাল.....	পাখা.....
তালপাতা.....	পয়সা.....
করুণ.....	লাঠি.....
চোখ.....	বর্ষা.....

করতে পারো

তোমরা মেলায় বেড়াতে গিয়েছে কি? সেখানে কী কী জিনিস পাওয়া যায়, সেগুলির নাম লেখো। তোমার বিশেষ পছন্দের দুটো জিনিসের ছবি এঁকে দেখাতে পারো।

চোর–দরওয়াজা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

ছত্রপতি শিবাজির বুদ্ধি ছিল শাণিত তরবারির মতোই তীক্ষ্ণধার, তা তোমরা হয়ত কেউ কেউ শুনে থাকবে। আর তা না হ'লে আলমগীরের মতো কূটবুদ্ধি বাদশা তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে হিমসিম খাবেন কেন?

রাজনীতি ও রণনীতিতে তাঁর মাথা যে কী রকম খেলত তার বহু গল্প আছে। আমি আজ বলছি অতি সহজ সাধারণ বুদ্ধির একটি কাহিনী।

যে লোক যখন–তখন অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে দুর্গের পর দুর্গ জয় করেছে নিজে–সে জানে যে এ দুর্গতি তারও একদিন হতে পারে। ছত্রপতিও, বেশকিছুটা প্রতিষ্ঠা লাভের পর নিজের জন্যে একটি নিরাপদ বাসা ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন–তাতে আর আশ্চর্য কি। অবশ্য একটা বাসা ঠিক ছিলই–রাজগড়ে, সেও বেশ দুর্গম, ও দুর্ভেদ্য, তবু যেন ঠিক পছন্দ হয় না রাজার, কেমন যেন মনটা খুঁতখুঁত করে, অথচ কী করবেন, কেমন করে নিশ্চিন্ত হবেন, তাও ভেবে পান না।

এই সময় বিজাপুর দরবার তার সঙ্গে একটা মিটমাট করবার ইচ্ছায় তাঁর বাবা শাহজিকে মুক্তি দিয়ে তাঁকেই মধ্যস্থতা করার জন্য দূত হিসেবে পাঠালেন শিবাজীর কাছে। শাহাজি আগে ছেলের ওপর যতই বিরক্ত হয়ে থাকুন, ইদানীং ছেলের জয়গৌরবে বেশ একটু গর্ববোধ করতে শুরু করেছিলেন, ছেলের এক–একটি অসমসাহসিক কীর্তি শুনতেন আর বুকটা তাঁর দশ হাত হয়ে উঠত।

সুতরাং শাহজিও চাইলেন তাঁর ছেলের বিপদের দিনের জন্যে একটা নিরাপদ আশ্রয় যেন ঠিক থাকে। ছেলের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে অনেকগুলো জায়গা দেখলেনও–রাজগড়, পুরন্দর, লোহাগড়, রায়রী। এর মধ্যে তাঁর রায়রীটাই পছন্দ হল বেশি। তাঁর অভিজ্ঞ চোখ এক চাহনিতেই দেখে নিল এখানে দুর্গ করার সুবিধাটা। ছেলেকেও বুঝিয়ে দিলেন সেটা। সহ্যাদ্রির পশ্চিমে এক সু–উচ্চ শিখরের ওপর জায়গাটা খাড়া উঠে গিয়েছে। এমনিতেই বেয়ে ওঠা কষ্টকর, তার ওপর যদি ভাল করে কেল্লা বানিয়ে ওঠবার পথগুলো ভাল করে

বন্ধ করা যায় তাহলে তো কথাই নেই।

শিবাজিও তাঁর বাবার দূরদৃষ্টির মর্ম বুঝলেন, মেনে নিলেন শাহাজির যুক্তি। এখানেই নূতন একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরী করে সেখানেই টাকাকড়ি কাগজপত্র এবং নিজের পরিবার রাখা স্থির করলেন। আবাজি শনিদেব নামে এক যোগ্য স্থপতিকে ডেকে তখনই সে দুর্গ নির্মাণের ভার দিলেন। শনিদেবের সঙ্গে বসে, বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে নিজে নকশা তৈরি করালেন–যাতে কোথাও কোনো খুঁত না থাকে। কেল্লার নামকরণ করলেন রায়গড়। স্থির হল একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় দুর্ভেদ্য প্রাচীর প্রাকারের বেষ্টনীর মধ্যে তাঁর দপ্তরখানা, বাস করার প্রাসাদ ও চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, বিচারালয় প্রভৃতি সরকারি ভবনগুলি তৈরি হবে, এবং কিছু নিচে অথচ আর একটি চূড়ার ওপর মায়ের জন্য হবে একটি ছোট্ট বাড়ি ও মন্দির।

পড়ে কী বুঝলে?

1. ছত্রপতি কে?
2. বিজাপুর দরবার মধ্যস্থতা করবার জন্য দূত হিসাবে কাকে পাঠিয়েছিল?
   (ক) শিবাজিকে (খ) শাহজিকে
3. নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য কোন্ জায়গা পছন্দ হলো?
   (ক) পুরন্দর (খ) রায়রী
   (গ) লোহাগড়

দুর্গ তৈরি শেষ হল একসময়। শনিদেব সমস্তটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে ছত্রপতিকে বললেন, বেশ একটু গর্বের সঙ্গেই, 'এই যে রাস্তা আমি তৈরি করে দিয়েছি, তা সাতদফা ফটক এবং প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে উঠেছে–এ ছাড়া আর কোথাও দিয়ে কেউ প্রাসাদে ঢুকতে পারবে না। যে উঠবে তাকে আমাদের চোখের সামনে দিয়ে উঠতে হবে, এ ছাড়া একটা টিকটিকি যাবারও উপায় রইল না কোনো জায়গা দিয়ে।

শিবাজি কথাটার তখনই কোন উত্তর দিলেন না, শুধু একটু হাসলেন।

নিচে এসে আশেপাশের গ্রামে ঢোলের সাহায্যে ঘোষণা করে দেওয়ালেন, যদি কোনো লোক এই দুর্গের সদর সরকারী রাস্তা ছাড়া অন্য কোনোপথে ঐ দুর্গের পতাকাস্তম্ভে উঠতে বা পৌঁছতে পারে–তাকে তিনি এক থলে মোহর এবং এক জোড়া সোনার বালা উপহার দেবেন।

এতখানি পুরস্কারের লোভে কেউ কেউ যে এ চেষ্টা করবে না, তা সম্ভব নয়। কয়েকজনই করল এবং ব্যর্থও হল। শনিদেব হেসে বললেন, 'দেখলেন তো রাজাধিরাজ,

বলিনি আপনাকে যে কোনো মানুষের পক্ষে একাজ সম্ভব নয়।

ছত্রপতি আবারও হাসলেন একটু।

তৃতীয় দিনের দিন স্থানীয় মাহার অধিবাসীদের মধ্যে থেকে একটি তরুণ যুবক এল। এরা এক শ্রেণীর পার্বত্য জাতি–কিন্তু খুব শক্তসমর্থ এবং কষ্টসহিষ্ণু বলে ছত্রপতিই প্রথম এদের নিজের সেনাদলে নিয়েছিলেন। মাহার তরুণটি এসে একটি বিশেষ পতাকা দেখিয়ে দু'হাত জোড় করে বলল, 'যদি অনুমতি দেন তো আমি আমার এই পতাকা ঐ নিশানবুরুজে লাগিয়ে দিয়ে আসি!'

'স্বচ্ছন্দে। দিলে বকশিশ পাবে। যা আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার নড়চড় হবে না।' আশ্বাস দিয়ে বললেন ছত্রপতি।

তরুণ বালকটি আর একবার তাঁকে প্রণাম করে পাহাড়ে পিছন দিকের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রায় ঘন্টাখানেক পরে সকলেই অবাক হয়ে চেয়ে দেখল–তার মধ্যে আবাজি শনিদেবও একজন–যে, ছত্রপতির গেরুয়া পতাকা নয়, সেই মাহারেরই দেখিয়ে–যাওয়া পতাকা উড়ছে পৎপৎ করে।

আরও ঘন্টাখানেক পরে সে ফিরে এসে আর একবার ছত্রপতিকে প্রণাম করে হাতজোড় করে দাঁড়াল। শিবাজি শনিদেবের মুখের দিকে চেয়ে আর একবার হাসলেন। তারপর হুকুম দিলেন, সেই প্রতিশ্রুত এক থলে মোহর ও সোনার বালা জোড়া ওকে এনে দিতে। কিন্তু সেই সঙ্গেই বললেন, 'বাপু, কোন পথে ঠিক উঠলে সেটা আমাকে একটু দেখিয়ে দিতে হবে।'

পথ অবশ্য সেটা নয়–দুর্গম পাকদণ্ডী বা পায়ে চলা রাস্তা,তাও মধ্যে মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, পাথর ধরে ধরে কিংবা গাছের শিকড় ধরে ধরে বুকে হেঁটে উঠতে হয়–তবু শিবাজি মহারাজ সে পথও বন্ধ করলেন তার মুখে প্রকাণ্ড একটা ফাটক(দুদিকে সান্ত্রীপাহারার ব্যবস্থা সুদ্ধ) বানিয়ে। সেই ফটকটিরই নাম হল 'চোর দরওয়াজা'।

বুঝলে–কত সহজে কাজটা হয়ে গেল? তুমি আমি হলে কি করতুম? নিজেরাই ঘুরে ফিরে দেখে গলদঘর্ম ও হয়রান হতুম।

অবশ্য, এছাড়াও আর একটি পথের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল–কিছুদিনের মধ্যেই। সেও আবাজির আর একদফা পরাজয়—আর এবার এক অশক্ষিত গ্রাম্য মহিলার কাছে।

হীরাকানি নামে এক গয়লাদের বউ কেল্লায় আসত দুধ বেচতে। একদিন দুধ দিতে দিতে কখন বেলা চলে গেছে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে অত বুঝতে পারেনি। কেল্লার নিয়ম–সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ফটক বন্ধ হবে, খুলবে সেই সূর্যোদয়ের পর। হীরাকানি যখন দৌড়তে দৌড়ত ফটকের কাছে পৌঁছল তার কিছু আগেই তা বন্ধ হয়ে গেছে। বিস্তর কান্নাকাটি করল সে, সান্ত্রীদের হাতে–পায়ে ধরল ফটক আর একটিবার খোলবার জন্যে–কিন্তু কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে ছত্রপতি–বা পেশোয়ার হুকুম না পেলে অসময়ে ফটক খুলবে।

ওধারে হীরাকানি ঘরে বাচ্চা মেয়ে আর বুড়ি শাশুড়ি ফেলে এসেছে, সে না গেলে তাদের খাওয়াই হবে না, মেয়েটা কেঁদে কেঁদে মরেই যাবে হয়ত। যেতে তাকে হবেই। সে এক দুঃসাহসিক কাজ করল। যাতয়াতের পথে একটা জায়গা তার জানা ছিল, সেখানটাই পাহাড়ে একটু খাঁজমতো আছে, আর সেই জন্যেই একেবারে চকচকে পাথর নয়–কিছু গাছপালাও আছে। হীরাকানি সেই অন্ধকারে ঘাস আর গাছের শেকড় ধরে ধরে পাহাড় বেয়ে সেইখান দিয়ে নামল এবং এক প্রহর উত্তীর্ণ হবার আগেই বাড়ি পৌঁছে গেল।

পড়ে কী বুঝলে?

1. গর্বের সঙ্গে কে বলল? "এছাড়া একটা টিকটিকি যাবারও রাস্তা নেই।"
2. শিবাজি প্রথমে কাদেরকে নিজের সেনা দলে নিয়েছিলেন?
3. গেরুয়া পতাকাটি কার?
   (ক) শিবাজির (খ) তরুণ যুবকটির।

কথাটা চাপা রইল না, লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে এক সময় ছত্রপতির কানেও পৌঁছল। তিনি বউটিকে ডাকিয়ে এনে ঠিক কোন্ পথে সে নেমেছিল দেখে নিলেন তার পথ। সে পথ বন্ধ করে সেখানটার ঠিক মুখে একটা প্রকাণ্ড মিনার বসালেন। আজও সে মিনার আছে, সেই গয়লা বউয়ের দূর্ধর্ষ সাহসের পরিচয় বহন করে..'হীরাকানি মিনার' নামে। সেখানে গেলে আজও দেখতে পাবে।

পড়ে কী বুঝলে?

1. কেল্লায় কে দুধ দিতে আসতো?
   (ক) গয়লা (খ) গয়লাদের বউ
2. ঘরে কে বাচ্চা মেয়ে ও বুড়ি শাশুড়ি ফেলে এসেছিল?
3. মিনারটির নাম কী দেওয়া হয়েছিল?

জেনে রাখো

চোর দরওয়াজা	–	দরজা (শব্দটি ফারসী থেকে এসেছে) সদর দরজার পেছনে গুপ্ত দরজা থাকে যে দরজার খবর সবাই জানে না। তাকে চোর দরজা বলা হয়।
স্থপতি	–	স্থাপনকর্তা, নির্মাণ কর্তা
দুর্গ	–	কেল্লা, নিরাপদ আশ্রয় স্থল
দুর্ভেদ্য	–	কঠিন, ভেদ করা শক্ত
বেষ্টনী	–	ঘেরা
গর্ব	–	অহংকার
মোহর	–	স্বর্ণমুদ্রা
কষ্টসহিষ্ণু	–	যে কষ্ট সহ্য করে
তরুণ	–	নব যুবক, কিশোর
আশ্বাস	–	ভরসা
প্রতিশ্রুতি	–	কথা দেওয়া, প্রতিজ্ঞা
সাষ্টাঙ্গে	–	নতমস্তকে (জানু, পদ, হস্ত, বক্ষ, মস্তক, দৃষ্টি, বুদ্ধি, বাক্য–এই আটটি অঙ্গের সাথে প্রণাম করা)
দুর্গম	–	কঠিন পথ
পাকদন্ডী	–	সরুপথ, হেঁটে চলার পথ
ফটক	–	দরজা, বড় গেট
সাম্ত্রী	–	সৈন্য
গলদঘর্ম	–	ঘেমে যাওয়া
পেশোয়া	–	মারাঠা রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী
প্রহর	–	সময়ের মাপ, একরাতে চার প্রহর
দুর্ধর্ষ	–	দুর্দান্ত, যাকে পরাজিত বা দমন করা যায় না।

শিবাজী মারাঠা বীর ছিলেন। তাঁর জীবনের একটি ছোট্ট ঘটনা 'চোর দরওয়াজা' গল্পটির মাধ্যমে বলা হয়েছে।

পাঠবোধ

1. খালি জায়গাগুলি ঠিক শব্দ দিয়ে ভরো

   হাসলেন, রামগড়, নিরাপদ, কুটবুদ্ধি, গর্ববোধ

   ক. আলমগীরের মতো.....বাদশা তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছেন।

   খ. শিবাজি নিজের জন্যে একটি.....বাসা ঠিক করতে ব্যস্ত হলেন।

   গ. ইদানীং ছেলের জয়গৌরবে বেশ একটু .....করতে শুরু করলেন।

   ঘ. নতুন কেল্লার নামকরণ হলো.....।

   ঙ. শিবাজি শনিদেবের মুখের দিকে চেয়ে আর একবার.....।

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ–

2. শাহ্‌জি কে?
3. কে এক চাহ্‌নিতেই দুর্গ তৈরি করার জায়গা নির্দিষ্ট করেছিল?
4. মায়ের জন্য কোথায় বাড়ি ও মন্দির তৈরি হল?
5. শিবাজি তরুণ যুবকটিকে কী উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন?

সংক্ষেপে লেখো ঃ–

6. বিজাপুর দরবার কেন শাহ্‌জিকে মুক্তি দিয়ে তাঁকেই শিবাজির নিকট পাঠায়?
7. চোর দরওয়াজা কী দিয়ে বন্ধ করা হলো ও কেন?
8. হীরাকানি সান্ত্রীদের হাতে-পায়ে ধরে কেন কান্নাকাটি করেছিলো?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ–

9. ছত্রপতি কেন রামগড়ে দুর্গ তৈরি করালেন?
10. শিবাজি ঢোল বাজিয়ে উপহার দেওয়ার জন্য কেন প্রতিশ্রুতি দিলেন?
11. কি ভাবে বালকটি সদর রাস্তা ছেড়ে কেল্লার ভেতর প্রবেশ করলো? 'চোর দরওয়াজা' গল্পটি অবলম্বনে লেখো।
12. মিনারটির নাম হীরাকানি কেন দেওয়া হলো ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত শব্দ লেখো।

দুর্গম	শিক্ষিত
অভিজ্ঞ	পুরুষ
সাধারণ	গ্রাম্য
ইচ্ছা	উত্তীর্ণ
যুক্তি	নিয়মিত

2. শব্দগুলি বহুবচনে লেখো

দুর্গ	ছেলে
সৈন্য	আমি
মিনার	মোহর

3. নিচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করো

হিমসিম : .....

দুর্গতি :.....

খুঁতখুঁত :.....

পতাকা স্তম্ভে :.....

সাষ্টাঙ্গ :.....

ফটক :.....

দূর্ধর্ষ :.....

ঝড়

মৈত্রেয়ী দেবী

ওমা, সেদিন হাটের বারে, মাঠের ধারে–
করতে গেছি খেলা
–দুপুর বেলা
এমন সময়, এলোমেলো
কোথা থেকে বাতাস এলো।
হঠাৎ থেকে থেকে
অন্ধকারে সমস্ত দিক কেমনে দিল ঢেকে!
বল্লে ওরা, ছুটে পালাই ঘর
ওই এসেছে ঝড়।
আমার যেন লাগল ভারী ভালো,
চেয়ে দেখি–আকাশখানা এক্কেবারে কালো
কালো হ'ল বকুলতলা,

কালো চাঁপার বন,
কালো জলে দিয়ে পাড়ি
আস্‌ল মাঝি তাড়াতাড়ি,
কেমন জানি করল আমার মন!
–ঝড় কারে মা কয়?

আমার মনে হয়, –
কাদের যেন ছেলে,
কালির দোয়াত কেমন করে হঠাৎ দিল ফেলে
যেমন করে' কালি–
আমি তোমার মেজের উপর ঢালি!
হাসল কোমল ঠোঁটটি মেলে
ভীষণ কেমন আগুন জ্বেলে
আকাশ বারে বারে,
আবার বুঝি ঘুরে ঘুরে
পালিয়ে গেল অনেক দূরে–
সাত সাগরের পারে।

জেনে রাখো

সাত সাগর –

1. প্রশান্ত মহাসাগর
2. ভারত মহাসাগর
3. আটলান্টিক মহাসাগর (অতলান্তিক মহাসাগর)
4. আর্কটিক মহাসাগর
5. বঙ্গোপসাগর
6. আরবসাগর
7. ভূমধ্যসাগর

কাব্য পরিচয়

দুপুরবেলা মাঠের ধারে খেলতে গিয়ে হঠাৎ করে ঝড়ের আগমন। প্রচন্ড বাতাস বয়ে আনে কালো মেঘ, ছড়িয়ে পড়ে সারা আকাশ। বন্ধুরা সব ভয়ে ছুটে পালালো বাড়ির দিকে। ছোট ছেলেটির চোখে এই ঝড় কোনো ভয় নয়, প্রকৃতির এক সুন্দর রূপ নিয়ে এলো। দিনের বেলায় কালো আকাশ, কালো ফুলের বন, কালো নদীর জলে নৌকো নিয়ে মাঝির তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসা। এ যেন মন কেমন করা পরিবেশ। মনে হয় আকাশে বুঝি কেউ দোয়াত উপুড়

করে সব কালিটুকু ছড়িয়ে দিয়েছে। ঠিক যেমন করে সে মায়ের ঘরে মেঝের উপর কালি ফেলে দেয়। বিদ্যুতের চমক যেন আকাশে আগুনের শিখা। মেঘগুলি যেন আগুনের শিখা জ্বেলে হঠাৎ করেই বহুদূরে সাতসাগরের পারে পালিয়ে গেল।

পাঠবোধ

সংক্ষেপে উত্তর দাও

1. 'ঝড়' কবিতাটির কবির নাম কী?
2. 'ঝড়' কবিতায় ছোট ছেলেটি কোথায় খেলা করতে গিয়েছিল?
3. দুপুর বেলা হঠাৎ অন্ধকার কেন হোল?
4. ঝড়ের সময় আকাশের রং কেমন হয়ে গিয়েছিল?

বিস্তারিতভাবে লেখো

5. হঠাৎ করে ঝড় এসে প্রকৃতির রূপকে কিভাবে বদলে দিল?
6. ঝড় দেখে ছোট ছেলেটির কী মনে হয়েছিল বিস্তারিতভাবে লেখো।
7. অর্থ বোঝা যায় এমনভাবে বাঁদিকের শব্দগুলির সঙ্গে ডানদিকের শব্দগুলি মেলাও।

এলো	কানি
দলা	ঝুলি
ঝুলো	মেলো
কানা	দলি
ভ্যাবা	বলি
বলা	চ্যাকা

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বানানগুলি ঠিক করে লেখো

ঝর	তারাতারি
হটাৎ	ভিষন
দুরে	

2. নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য তৈরি করো

অন্ধকার	মাঝি
হাট	আগুন
বাতাস	সাগর

3. বিপরীত শব্দ লেখো

ভালো	ভারী–ভারী
সময়	কালো
ছেলে	কোমল

করতে পারো

তোমরা নিশ্চয়ই ঝড়ের মুখোমুখি হয়েছ। যারা শহরে থাকো তাদের কাছে ঝড়ের রূপ একরকম আর যারা গ্রামে থাকো তাদের কাছে ঝড়ের রূপ অন্যরকম। তোমাদের দেখা ঝড়ের বর্ণনা সুন্দরভাবে গুছিয়ে লেখো।

জঙ্গলের কত্তারা

জোমো কেনিয়াট্টা

অনেকদিন আগেকার কথা, এক হাতি এসে মানুষের সঙ্গে বন্ধুতা পাতাল। একদিন তুমুল ঝড়বৃষ্টি নামল। তখন হাতিকত্তা জঙ্গলের ধারে তার বন্ধুর যেখানে একটি কুঁড়েঘর ছিল সেখানে এসে বলতে লাগল, মিতে, মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে, তোমার কুঁড়েঘরের মধ্যে আমার শুঁড়টা একটু রাখতে দাও না ভাই।

মানুষ তার বন্ধুর দশা দেখে বলল, মিতে, আমার ঘরটি ছোট্ট বটে, কিন্তু এখানে আমার সঙ্গে তোমার শুঁড়ের জায়গাও হয়ে যাবে। তবে দেখো ভাই, শুঁড়টা একটু সামলেসুমলে ঢুকিয়ো।

হাতিকত্তা তখন মানুষকে আশীর্বাদ করতে-করতে বলতে লাগলো, তুমি আমার যে উপকার করলে একদিন তার প্রতিদান আমি তোমাকে নিশ্চয়ই দেব। এই বলেই না সে তার শুঁড়টি ঘরের মধ্যে সেঁধিয়ে দিল, তারপর আস্তে-আস্তে ঢোকাল তার মাথা, শেষটায় মানুষকে ধাক্কা মেরে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বার করে দিয়ে বন্ধুর ঘরের মধ্যে দিব্যি আরামে শুয়ে পড়ল, আর তাকে ডেকে বলল, দ্যাখো মিতে, তোমার চামড়া তো আমার চাইতে শক্ত, তাই ঘরে যখন দুজনের জায়গা হচ্ছে না, তখন তুমিই না হয় বৃষ্টির মধ্যে থাকো, আর আমি আমার মোলায়েম চামড়াটাকে ঝড়ঝাপটা থেকে বাঁচাই।

পড়ে কী বুঝলে?

1. জঙ্গলের ধারে কার একটি কুঁড়ে ঘর ছিল?
2. হাতিকত্তা কুঁড়ে ঘরের মধ্যে কী রাখতে চাইল?

মানুষ তো তার বন্ধুর এই ব্যবহার দেখে হৈ-চৈ জুড়ে দিল। আশপাশের জঙ্গল থেকে জানোয়ারেরা হট্টগোল শুনে কী হয়েছে দেখতে ছুটে এল, আর ভিড় করে দাঁড়িয়ে মানুষ আর তার বন্ধু হাতিকত্তার ঝগড়া শুনতে লাগল। যখন তুলকালাম চলছে, তখন হঠাৎ সিংহকত্তা গর্জন করতে-করতে এসে হাজির, এসেই সে উঁচুগলায় বলে উঠল, জানিস না আমি এই জঙ্গলের রাজা? কোন সাহসে তোরা আমার রাজ্যের শান্তিভঙ্গ করিস? হাতিকত্তা ছিল জঙ্গলরাজ্যের বড়োমন্ত্রী। সে তখন বিনয় করে উত্তর দিল, হুজুর, আমরা

আপনার রাজ্যের শান্তিভঙ্গ করছি না। এই যে ছোট্ট কুঁড়েঘরটিতে হজুর আমাকে শুয়ে থাকতে দেখছেন, তার দখল নিয়ে আমার এই বন্ধুর সঙ্গে একটু কথাবার্তা হচ্ছে। সিংহকর্তা দেখল, রাজ্যে শান্তি বজায় না থাকলে তো মুশকিল। সে গম্ভীরভাবে বলল, আমি হুকুম দিচ্ছি মন্ত্রীরা এক্ষুনি এ-ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য ক'জন মাতব্বরকে লাগিয়ে দিক, আর তারা তাড়াতাড়ি করে আমাকে তাদের মতামত জানাক। তারপর সে মানুষের দিকে ফিরে বলল, আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছ, তা বেশ ভালোই করেছ। আর হাতিমন্ত্রীর মতো এমন মান্য গণ্য লোক দেশে আর ক'টা আছে? হৈ-চৈ কোরো না, তোমার কুঁড়েঘর তোমারই থাকবে। সবুর করে দ্যাখো, আমার রাজকীয় বিচারসভা যখন বসবে তখন তোমার সব কথা বলার সুযোগ পাবে তুমি। আমার সন্দেহ নেই বিচারের ফলাফলে তুমি খুশি হয়ে যাবে। জঙ্গলের রাজার এই মিষ্টি কথা শুনে সরল মানুষ ভুলে গেল, আর তার কুঁড়েঘর তাকেই ফেরৎ দেওয়া হবে এই আশা করে বসে রইল।

হাতিকত্তা রাজার আজ্ঞা পেয়ে অমনি অন্য মন্ত্রীদের সঙ্গে তদন্ত করার লোক খুঁজতে বেরোলো। খুঁজে খুঁজে এই কাজের জন্য বনের পাঁচ মাতব্বরকে সে জোগাড় করল, তাঁরা হলেন : ১. গণ্ডারকত্তা, ২. মোষকত্তা, ৩. কুমিরকত্তা, ৪. ধর্মাবতার শেয়াল, যিনি সভাপতি হবেন, আর ৫. চিতাকত্তা, যিনি কাগজপত্র সামলাবেন। মাতব্বরদের নাম শুনেই তো মানুষ খুব আপত্তি করল, আর বলল, আমার জাতভাইদের কাউকে বিচারকদের মধ্যে না রাখলে কী করে চলবে? তা শুনে সবাই তাকে বলল, তোমার জাতভাইয়েরা লেখাও শেখেনি, পড়াও শেখেনি, জঙ্গলের চুলচেরা আইনকানুন তারা কী বুঝবে? তাছাড়া ভয়ই বা কীসের? যাদের হাতে বিচারের ভার দেওয়া হয়েছে, ন্যায়পরায়ণতার জন্য তাদের নামডাক আছে, আর যে-সব জাত নখদন্ত বিশেষ কিছুই পায়নি তাদের দেখ্‌ভাল করার দায় স্বয়ং ভগবান এদের ওপর দিয়েছেন। নিশ্চিন্তে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও, দেখবে ওরা কত যত্নে খোঁজখবর নিয়ে ঠিক-ঠিক ন্যায়বিচার করবে।

পড়ে কী বুঝলে?

১. হাতিকত্তা বিচার সভায় কাদের ডেকেছিল?

২. জঙ্গলের রাজা কে?

সাক্ষীদের তখন সভার সামনে হাজির করা হল। আগে ডাক পড়ল হাতিকত্তার।হাতি গিন্নির জোগাড়-করা একটি চারাগাছ দিয়ে দাঁতন করতে-করতে গুরুগম্ভীর মেজাজে তিনি এলেন। তারপর ভারিক্কি চালে বলতে শুরু করলেন, জঙ্গলের কত্তারা সব শুনুন,বলবই বা কী, আপনাদের জানা গল্পটা আবার আপনাদের সামনে বলে আপনাদের দামি সময় নষ্টই বা করব কেন। বন্ধুদের যাতে ভালো হয় সর্বদাই সেদিকে খেয়াল রাখাটা আমার দায়িত্ব বলে আমি মনে করি, আর তাই করতে গিয়েই না আমার এই বন্ধুটির সঙ্গে ভুলবোঝাবুঝি হয়েছে। সেই যেদিন খুব ঝড় বইছিল, বন্ধু আমাকে ডেকে বলল, মিতে, আমার কুঁড়েঘরটা বাঁচাও। কুঁড়ের মধ্যে অনেকটা ফাঁকা জায়গা ছিল কিনা, তার মধ্যে দিয়েই ঝড়টা বইছিল, তাই আমার বন্ধুর মুখ চেয়ে বাধ্য হয়েই ঐ অকেজো জায়গাটা আমি কাজে লাগানোর বন্দোবস্ত করলাম, নিজে তার মধ্যে ঢুকে বসে। এরকম অবস্থায় পড়লে আপনারও কি একই ভাবে দায়িত্ব পালন করতেন না?

হাতিকত্তার এমন গোছানো কথা শুনে বিচারকরা হায়েনাকত্তা আর জঙ্গলের অন্যান্য মান্যগণ্য লোকদের তলব করলেন। তাঁরা সকলেই হাতিকত্তার কথায় সায় দিলেন. তারপর মানুষের ডাক পড়ল। যেই না সে এসে সাক্ষ্য দেওয়া শুরু করেছে, অমনি বিচারকরা তাকে চুপ করিয়ে দিয়ে বললেন, বাপু হে, কাজের কথাটুকু বললেই হবে। কী ঘটেছিল না ঘটেছিল সে গল্প আমরা ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীদের মুখ থেকেই শুনেছি। তোমাকে শুধু এইটুকু জানাতে হবে যে তোমার ঘরের অকেজো ফাঁকা জায়গাটা হাতিকত্তার আগে আর কারো দখলে ছিল কিনা। মানুষ বলল, তা ছিল না, হুজুর, কিন্তু-। সে আর-কিছু বলার আগেই বিচারকরা বললেন, ব্যাস্ ব্যাস্, দুপক্ষেই যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ শোনা হয়েছে, এবার আমরা রায় কী হবে তা ঠিক করতে একটু আড়ালে যাব। হাতিকত্তা তাঁদের সেদিন নেমন্তন্ন করেছিলেন, ভুরিভোজ করার পর কত্তারা তাঁদের রায় দিলেন। তাঁরা মানুষকে ডেকে বলে দিলেন, দ্যাখো বাপু, আমাদের মতে তোমার পিছিয়ে পড়া ধ্যানধারণার জন্যই গণ্ডগোলটা বেধেছে। হাতিকত্তা তো তোমার ভালোর কথা ভেবেই তোমার ভার মাথায় করে নিয়েছেন। তোমার ঘরের অকেজো জায়গাটা যদি ঠিকঠাকমতো কাজে লাগানো যায় তাতে তো তোমারই লাভ, আর তোমার এখনও ততটা উন্নতি হয়নি যে কাজটা তোমাকে দিয়েই হবে। তাই ভেবেচিন্তে দু-পক্ষেরই সুবিধার জন্য আমরা বলছি যে মামলাটা আপসে মিটমাট হোক। হাতিকত্তা যেমন তোমার ঘরে থাকছেন, তেমনি থাকুন, আমরা তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি একটা নতুন জায়গা বেছে নিয়ে তোমার মাপমতো একটা ঘর তুলে নেবার। আর তুমি যাতে বিপদে না পড়ো তাও আমরা দেখব।

পড়ে কী বুঝলে?

1. বিচার সভায় সিংহরাজা কার কথায় বেশি গুরু ত্ব দিল?
2. বিচারকেরা মানুষকে তার নিজের ঘর ফিরিয়ে দিয়েছিল কি না?

মানুষ দেখল, সে নিরুপায়। রাজি না হলে বিচারকরা পাছে দাঁতে নখে তাকে ছিঁড়েই ফেলেন, তাই ভয়ে-ভয়ে তাঁদের কথামতোই সে কাজ করল। কিন্তু যেই না সে আরেকটি ঘর তুলেছে, অমনি গণ্ডাকত্তা শিং বাগিয়ে তেড়ে এসে তার মধ্যে ঢুকে পড়লেন, আর তাকে ভাগিয়ে দিলেন। আবার বিচারসভা বসল, আর ঠিক আগের মতোই রায় দিল তারা।

এইভাবে মোষকত্তা, চিতাকত্তা, হায়েনাকত্তা আর যারা যারা ছিল সবারই একটি করে নতুন ঘর হয়েগেল। তখন মানুষ দেখল বিচারসভার ওপর নির্ভর করে তার কিছুই হচ্ছে না, এবার আত্মরক্ষার অন্য উপায় ভাবতে হয়। সে তখন বসে পড়ে বলল, 'এ নগেন্‌ডা থি এ নডাগাগা মোটেগি' যার মানে পৃথিবীর মাটিতে যা চলে ফিরে বেড়ায় এমন যে-কোনো জন্তুকেই ফাঁদে ধরা যায়। অথবা আরেকটু ঘুরিয়ে বললে, 'বার-বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এবারে তোমার আমি বধিব পরান।'

জঙ্গলের কত্তারা যে ঘরগুলো দখল করে নিয়েছিল, সেগুলো যখন নড়বোড়ে হয়ে পড়ে যাবার মত হল তখন একদিন ভোর সকালে উঠে সে খানিকটা দূরে বেশ বড়োসড়ো আর সুন্দর দেখতে একটা ঘর বানাল। গণ্ডারকত্তা যেই ঘরটি দেখতে পেলেন অমনি তেড়ে এসে এক দৌড়ে ঢুকলেন তার মধ্যে। কিন্তু ঢুকে দেখেন ভেতরে হাতিকত্তা আগে থাকতেই শুয়ে ঘুমিয়ে আছেন। ক্রমে চিতাকত্তা জানলায় এসে হাজির হলেন, সিংহকত্তা, শেয়ালকত্তা, মোষকত্তা দরজা দিয়ে সেঁধোলেন, হায়েনাকত্তা ছেঁচতলায় জায়গা পাবার জন্য হল্লা জুড়লেন, আর কুমিরকত্তা ছাতের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে রোদ পোয়াতে লাগলেন। ক্রমশ কে আগে ঢুকেছে তাই নিয়ে ঝগড়া বাধল, ঝগড়া থেকে শুরু হল কামড়াকামড়ি আর সবাই মিলে তুলকালাম কাণ্ড চলছে তখন মানুষ এসে ঘরটায় আগুন লাগিয়ে দিল। জঙ্গলের কত্তারা সুদ্ধু সব পুড়ে ছাই হল। মানুষ বলল, কষ্ট না করলে শান্তি মেলে না, তবে কষ্টটা সার্থক। এই না বলে সে বাড়ি ফিরে গিয়ে সুখেস্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল।

[অনুবাদ-মালিনী ভট্টাচার্য]

জেনে রাখো

কত্তা	–	কর্তা শব্দটি থেকে মুখের ভাষায় কত্তা হয়েছে।
সবুর করো	–	অপেক্ষা করো
চুলচেরা	–	খুব সূক্ষ্ম
অকেজো	–	কাজ নেই
নিরুপায়	–	উপায় নেই

বধিব	–	বধ করব
পরান	–	প্রাণ
সেঁধোলেন	–	ঢুকলেন
ছেঁচতলা	–	বারান্দায় ছাউনির নিচে

পাঠ পরিচয়

জঙ্গলে একপক্ষে একজন দুর্বল মানুষ ও অন্যপক্ষে হিংস্র পশুদের মধ্যে ঘর দখলের বিরোধ। দুর্বল মানুষ ঝড়-বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করে একটি ঘর বানায় বিশালাকায় হাতি ঝড়-বৃষ্টিতে কেবল শুঁড়টুকু রাখবার আশ্রয় চায়। কিন্তু সামান্য শুঁড় রাখতে গিয়ে ঘরটি দখল করে নেয়। মানুষ প্রতিবাদ করে। জঙ্গলের রাজা সিংহ এসে মানুষকে সান্ত্বনা দেয় এবং গণ্যমান্য মন্ত্রী হাতি আশ্রয় নিয়েছে সুতরাং সুবিচার হবে। বিচারসভায় হাতি তার পক্ষ সমর্থন করবে এমন সব পশু নেতাদের ডেকে আনে। আড়ালে তাদের নেমন্তন্ন করে ভুরিভোজ করায়। বিচারে মানুষ সুবিচার তো পায়না বরং তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় অন্য একটি ঘর বানাতে। এবারও সেই নতুন ঘরটি গন্ডার, মোষ, চিতা, হায়েনা প্রভৃতির দখলে চলে যায়। মানুষ দেখল বিচার তো সে পাবেই না উল্টে দাঁতে নখে তাকে শেষ করে দেবে। সে বসে ভাবতে শুরু করলো। আগের ঘরগুলো পুরোনো হয়েই গিয়েছিল এবার সে বেশ বড় ও সুন্দর দেখতে একটা ঘর বানালো। গন্ডার দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকতেই দেখে হাতি আগেই দখল নিয়েছে। এবার একে একে সিংহ, শেয়াল, হায়না, কুমির সবাই এসে যে যার মতো দখল নিতে শুরু করে। প্রচন্ড ঝগড়া, হানাহানি চলছে, মানুষ এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সে এসে ঘরটায় আগুন লাগাতে সবাই পুড়ে মরল। মানুষ শান্তিতে বাড়ি গিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগল। গল্পটি ভালোভাবে পড়লে বুঝতে পারবে যেসব মানুষ শঠ, ধূর্ত, হিংসার আশ্রয় নিয়ে অন্যায়ভাবে অন্যকে ঠকায় বিপদে ফেলে, তাদের শেষ পরিণতি কখনও ভাল হয় না। উপস্থিত বুদ্ধি ও সততার জয় সর্বদা সর্বত্র হয়।

এই গল্পটি একটি প্রতীক,তোমরা বড় হলে বুঝতে পারবে আমাদের সমাজে এই ধরনের পশুর মতো চরিত্র আছে।

পাঠবোধ

1. ঠিক উত্তরটিতে (✓) চিহ্ন দাও।

   ক. হাতিকত্তা এসে মানুষের সঙ্গে কী করল?

   (বন্ধুত্ব, ঝগড়া, মারামারি)

   খ. জঙ্গলে হাতিকত্তা ও মানুষের ঝগড়ার সময় হঠাৎ সিংহকত্তা কী করতে হাজির হলো?

   (বর্জন, গর্জন, বর্ষণ)

   গ. হাতিকত্তা জঙ্গল রাজ্যের কোন মন্ত্রী ছিল?

   (মহামন্ত্রী, বড়োমন্ত্রী, ছোটমন্ত্রী)

   ঘ. পশুকত্তাদের সভাতে কে সভাপতি হবেন?

   (গন্ডারকত্তা, মোষকত্তা, শেয়াল)

   ঙ. জঙ্গলে সাক্ষীদের মধ্যে সবার আগে কার ডাক পড়লো?

   (কুমিরকত্তা, হাতিকত্তা, চিতাকত্তা)

2. খালি জায়গাটিতে ঠিক শব্দটি বসাও।

   বৃষ্টি, বন্ধুর, বড়োমন্ত্রী, আইনকানুন।

   ক. মুষলধার ..... নেমেছে।

   খ. মানুষ তার.....দশা দেখে বলল।

   গ. জঙ্গলের চুলচেরা.....তারা কী বুঝবে?

   ঘ. হাতিকত্তা ছিল জঙ্গলের রাজ্যের.....।

সংক্ষেপে উত্তর দাও

3. হাতিকত্তাকে মানুষটি কেন নিজের ঘরে জায়গা দিয়েছিল?
4. মানুষটি তার বন্ধুর ব্যবহারে কেন হৈ-চৈ করতে লাগল?
5. হাতিকত্তা বিচারকদের কেন ভুরিভোজ করিয়েছিল?

বিস্তারিতভাবে উত্তর দাও

6. হাতিকত্তা কিভাবে নিজের বন্ধুর ঘর দখল করে তাকে ঘর থেকে বেদখল করেছিল?
7. মানুষটির ঘর বার বার পশুরা অন্যায়ভাবে দখল করে নিচ্ছিল, অবশেষে সে কিভাবে অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা পেলো ? গল্পটি পড়ে নিজের ভাষায় লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত শব্দ লেখো

দয়া	ভয়
বন্ধু	জয়
দখল	গম্ভীর

2. একবচন থেকে বহুবচনে বদলাও

মানুষ	বন্ধু
হাতি	আমি
সে	তুমি

3. লিঙ্গ পরিবর্তন করো

জঙ্গলকত্তা	রাজ্যকন্যা
মহাশয়	কুমার
বুদ্ধিমান	সুন্দর

4. সন্ধি করো

আত্ম + রক্ষা =	পর + উপকার =
পুষ্প + অঞ্জলি =	কারা + আগার =
ন্যায় + উচিৎ =	

5. দুটি খোপের শব্দ মিলিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করে পাশের খালি জায়গায় লেখো।

ঝড়	মান	.....
বুদ্ধি	বান	.....
বল	ঝাপটা	.....
আইন	বার্তা	.....
কাগজ	কানুন	.....
কথা	পত্র	.....
ন্যায়	চিন্তে	.....
মান্য	মাট	.....
ভেবে	অন্যায়	.....
মিট	ঠাক	.....
ঠিক	গণ্য	.....

হিন্দু–মুসলমান

কাজী নজরুল ইসলাম

মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু–মুসলমান
মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।
এক সে আকাশে–মায়ের কোলে
যেন রবিশশী দোলে
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ীর টান।
মোরা, একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু–মুসলমান।।
মোরা এক সে দেশের খাই গো হাওয়া, এক সে দেশের জল
এক সে মায়ের বক্ষে ফলে এক ফুল ও ফল
এক সে দেশের মাটিতে পাই
কেউ গোরে কেউ শ্মশানে ঠাঁই
মোরা এক ভাষাতে মাকে ডাকি, এক সুরে গাই গান।

মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।

[সংক্ষেপিত]

জেনে রাখো

মোরা	–	আমরা
শশী	–	চন্দ্র
রবি	–	সূর্য
বৃন্ত	–	বোঁটা
কুসুম	–	ফুল
নয়ন	–	চোখ
তলে	–	নিচে
গোরে	–	মারা যাওয়ার পর যেখানে মুসলমানদের কবর দেওয়া হয়।
শ্মশান	–	মারা যাওয়ার পর হিন্দুদের যেখানে দাহ করা হয়।

কাব্য পরিচয়

পৃথিবী মায়ের কোলে জল মাটিতে বেড়ে ওঠা একটি গাছের একটি ডালে দুটি ফুলের মতোই দুটি সন্তান – হিন্দু ও মুসলমান। ঠিক যেন এক আকাশে চাঁদ ও সূর্যের মতো। এদের দুজনের দেহে একই রক্তের ধারা, একই মায়ের নাড়ির টান, একই দেশের হাওয়া-জলে এরা বড় হয়ে ওঠে। এই মাটিতেই এদের জীবন শেষ হয়। এরা একই ভাষায় মাকে ডাকে, একই সুরে গান গায়। যেন একই গাছের দুটি ফুল – হিন্দু, মুসলমান।

পাঠবোধ

1. নিচের ছক থেকে শব্দ তৈরি করো :-

বৃ অ শা	ন্ত

ন	য় বী তু	ন

আ	কা কা গা গা	শ র ছা য়ী

অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও

2. একই বৃন্তে দুটি কুসুম কাদের বলা হয়েছে?
3. রবি, শশী কোথায় দোলে?

সংক্ষেপে উত্তর দাও

4. 'হিন্দু-মুসলমান' কবিতায় কবি একই দেশের নয়নমণি এবং প্রাণ কাদের বলেছেন?

বিস্তারিতভাবে উত্তর দাও

5. 'হিন্দু মুসলমান' কবিতাটিতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে যে মিল, সেগুলি নিজের ভাষায় লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. ছক থেকে শব্দ তৈরি করে বাক্য রচনা করো:-

   উদাহরণ – প্রাণপণ – জয়লাভের জন্য তারা প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

প্রাণ	পণ প্রিয় দান ত্যাগ

2. বিপরীত শব্দ লেখো

সুর	এক
জল	স্বদেশ

করতে পারো –

1. বিভিন্ন ধর্মের কয়েকটি উৎসবের নাম লেখো।
2. কবিতাটি আবৃত্তি করো।

পৃথিবীর দৈর্ঘ্য–প্রস্থ ও নক্ষত্রের সংখ্যা

একদা মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর হুকুম করে পাঠালেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে– "তোমার কাছে আমি জানতে চাই–পৃথিবী কত লম্বা, কত চওড়া, এবং আকাশে নক্ষত্রই বা কতগুলি? তুমি যতশীঘ্র সম্ভব গণনা করে এর উত্তর আমার কাছে পাঠাবে।"

রাজার তো চক্ষুস্থির। এ আবার কি বেয়াড়া হুকুম? পৃথিবীর দৈর্ঘ্য–প্রস্থ মেপে বলা কি সোজা? আর নক্ষত্রের সংখ্যা কেউ গণনা করে বলতে পারে নাকি? কিন্তু পারবো না বললেই নবাব চটে যাবেন, সেও এক ভীষণ বিপদ। রাজা বড়ই চিন্তায় পড়লেন।

এমন সময় গোপাল এসে উপস্থিত। রাজাকে চিন্তাকুল দেখে সে কারণ জিজ্ঞাসা করলে। রাজা নবাবের উদ্ভট খেয়ালের কথা জানালেন গোপালকে। তখন গোপাল হেসে বললে –"ও–গণনা আমি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না মহারাজ! আপনি লিখে পাঠান–বাঁশ–দড়ি ইত্যাদি কেনবার জন্যে কিছু টাকা যেন পাঠিয়ে দেন। আমি বছর–খানেকের ভেতর সব গুণে–গেঁথে ঠিক করে দেবো।"

রাজা তখনই গোপালের পরামর্শ মত চিঠি লিখে পাঠালেন নবাব–দরবারে। নবাব খেয়ালী লোক। পৃথিবীর দৈর্ঘ্য–প্রস্থ আর নক্ষত্র–সংখ্যা গণনা করবার উপযুক্ত লোক পাওয়া গেছে শুনে, তার খরচার জন্য তখনই এক হাজার টাকা তিনি পাঠিয়ে দিলেন কৃষ্ণনগরে। গোপাল সেই টাকা নিয়ে দেদার বড় মানুষি করতে থাকলো এক বছর ধরে। রাজা যখনই জিজ্ঞাসা করেন– "কতদূর কি হলো গোপাল?" তখনই সে উত্তর দেয়–"সব ঠিক হয়ে যাবে মহারাজ! একটা বছর যেতে দিন তো!"

পড়ে কী বুঝলে?

1. পদ মর্যাদায় কে বড়?
   (ক) নবাব বাহাদুর
   (খ) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র
2. নবাবের উদ্ভট খেয়াল কী ছিল?
3. "ও গণনা আমি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না" এই কথাটিতে 'আমি' কে? কাকে এই কথাটা বলেছে?

ঠিক এক বছর পরে নবাব তাগাদা করে পাঠালেন–"গণনার কতদূর কি হলো?"

কৃষ্ণচন্দ্র গোপালকে ডেকে বলললেন–"এবার কি বলা যায় নবাবকে?"

গোপাল বললে–"আপনি লিখে দিন, মাপজোখ, গণনা এখনও শেষ হয়নি। এদিকে

টাকা ফুরিয়ে গেছে। আরও বাঁশ-দড়ি কিনতে হবে। আর কিছু টাকা চাই।"

কৃষ্ণচন্দ্রের এত্তেলা পেয়ে নবাব আরও এক হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলেন সঙ্গে-সঙ্গেই।

আবার ছ'মাস পরে নবাব তাগাদা ক'রে পাঠালেন। এবার কৃষ্ণচন্দ্র বললেন-"না গোপাল, এখন যা হয় একটা কিছু না করলেই নয়। শেষকালে নবাব তোমার আমার দু'জনের ওপরই ভীষণ চটে অনর্থ করবেন।" গোপাল তাঁকে অভয় দিয়ে মুর্শিদাবাদ যাত্রার জন্যে তৈরী হতে লাগলো। সে পনেরো-খানা গরুরগাড়ী

পড়ে কী বুঝলে?

1. পৃথিবীর লম্বা-চওড়া মাপবার জন্য গোপাল কী কিনতে চাইল?
2. গোপাল গণনা করার জন্য কতদিনের সময় চেয়েছিলেন?
3. নবাব খরচের জন্য প্রথমে কত টাকা পাঠালেন?

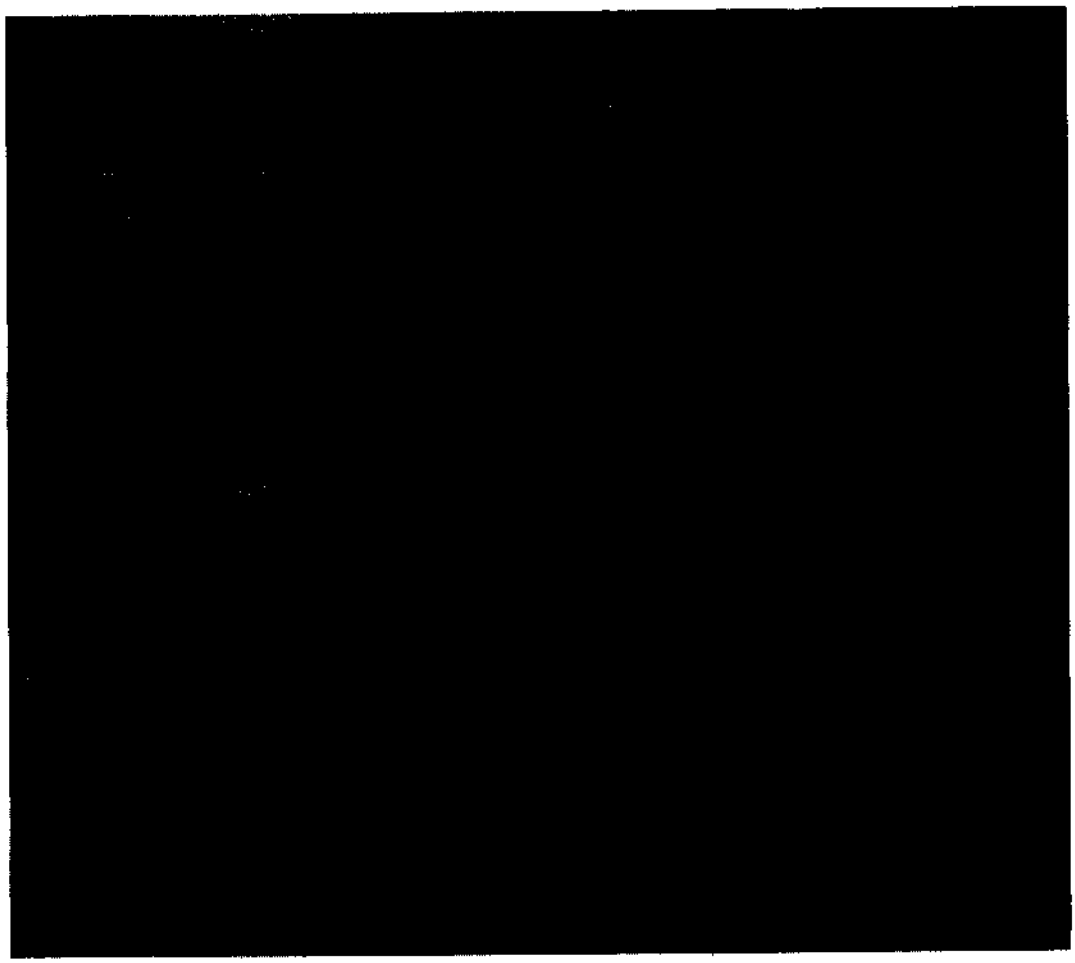

বোঝাই করলে সরু দড়ি দিয়ে, আর পাঁচটা নিলে–ঘন লোমওয়ালা বড়–বড় ভেড়া। এই সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে গোপাল নবাব–দরবারে গিয়ে হাজির হলো, নবাবকে কুর্ণিশ করে নিবেদন করলে–"খোদাবন্দ! আমি অতি কষ্টে পৃথিবীর দৈর্ঘ্য–প্রস্থ মেপে এনেছি, নক্ষত্রের সংখ্যাও গণনা করেছি। তবে মাপের দড়িগুলো এখনো মাপা হয়নি। আর নক্ষত্রের হিসাব রেখেছি ঐ পাঁচটা ভেড়ার গায়ে। ওদের গায়ে যত লোম আছে, আকাশের নক্ষত্রও ঠিক অতগুলো। এখন হুজুরকে মেহেরবানি করে ঐ দড়িগুলো মেপে নিতে হবে আর ঐ ভেড়াগুলোর লোম গুণে নিতে হবে।"

নবাব শুনেই স্তম্ভিত! ঐ পনেরো গাড়ী বোঝাই সরু দড়ি আর ঐ ভেড়ার লোম গুণে নেওয়া কি সোজা কাজ? ও কাজ করতে হলে তো রাজ্যের সমস্ত ছোট–বড় কর্ম্মচারীকে সমস্ত কাজ ত্যাগ করে ছ'মাস এখন ওই নিয়েই থাকতে হয়! তিনি রেগে বললেন–"আমি পারবো না ওসব মাপতে আর গুণতে। তুমি মেপে আর গুণে যা ঠিক করেছো তাই বলো।"

গোপাল তখন গম্ভীর ভাবে বললে–"পৃথিবী লম্বায় হ'লো তিন পরার্দ্ধ নিরানব্বই অর্ব্বুদ গজ। আর চওড়ায় হলো, দুই পরার্দ্ধ, সাত মহাপদ্ম, সত্তর কোটী, বাহান্ন লক্ষ ছয়শো একত্রিশ গজ। আর নক্ষত্রের সংখ্যা হলো, তিনশো তেত্রিশ কোটী পরার্দ্ধ"।

পড়ে কী বুঝলে?

১. গোপাল কোথায় যাত্রা করবার জন্য তৈরি হোল?

২. আকাশে নক্ষত্রের হিসাব দেবার জন্য সে সঙ্গে কী নিয়েছিল?

৩. সুবিবেচক শব্দটির অর্থ কী?

নবাব চেঁচিয়ে বললেন–"তিনশো তেত্রিশ কোটী পরার্দ্ধ? সেটা কত হে?"

গোপাল বললে–"ধারাপাতে হিসাব আছে–একশো কোটীতে এক অর্ব্বুদ, একশো কোটী অর্ব্বুদে এক পদ্ম–একশো কোটী পদ্মে–"

নবাব দুই কানে হাত চাপা দিয়ে বললেন–"রক্ষা করো বাপু তুমি! তোমার দড়ি–গাড়ী, ভেড়া আর ধারাপাত নিয়ে বিদায় হও শীগ্‌গির! তোমার অঙ্কের ঠেলায় আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে।"

গোপাল ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে-''খোদাবন্দ! এত মেহনৎ করে হুজুরের হুকুম তামিল করলাম। পৃথিবীটা যে এত লম্বা এক আকাশের যে নক্ষত্র এত বেশী, সেটা কি আর বান্দার কসুর?

নবাব সুবিবেচক লোক। বললেন-''না-না, তা বলতে পারিনে। তুমি সত্যিই মেহনৎ করেছো বটে। দাও তো উজীর! একে হাজার টাকা বকশিশ দিয়ে এখনি বিদায় করো।''

আবার হাজার টাকা বকশিশ নিয়ে গোপাল মুর্শিদাবাদের বাজারে গেল। সেখানে পনেরো গাড়ী দড়ি আর ভেড়া পাঁচটা বিক্রী করে দিয়ে, হাসিমুখে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করলে। বলা বাহুল্য, রাজাও তাকে আর-এক দফা পুরস্কার দিলেন।

জেনে রাখো

মানুষ বিপদে পড়লে উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে কিভাবে বিপদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে তার সরস সুন্দর উদাহরণ এই ছোট গল্পটি।

কৃষ্ণনগর	–	পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত একটি ছোট জেলা
ভাঁড়	–	বিদূষক, পরিহাস করতে পারে এমন ব্যক্তি
কুর্ণিশ	–	সেলাম
বান্দা	–	ভৃত্য
অনর্থ	–	অমঙ্গল, ভুল অর্থ, অনিষ্ঠ
মেহেরবানি	–	দয়া
ক্ষুণ্ণ	–	দুঃখিত
কসুর	–	অপরাধ
সুবিবেচক	–	ভালভাবে যে বিচার করে
উজীর	–	মন্ত্রী
ধারাপাত	–	গণিতের প্রাথমিক সূত্র

পাঠবোধ

সংক্ষেপে উত্তর দাও

1. কোথাকার নবাব বাহাদুর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে হুকুম পাঠালেন?
2. মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কোথাকার রাজা ছিলেন?
3. নবাবের পাঠানো প্রথম একহাজার টাকা নিয়ে গোপাল কী করল?
4. দ্বিতীয়বারে নবাবের পাঠানো টাকা দিয়ে গোপাল কী কিনল?
5. গোপাল কয়টি গাড়ি নিয়ে কোথায় যাত্রা করল?
6. পৃথিবীর দৈর্ঘ্য প্রস্থের মাপ গোপাল কিসে রেখেছিল?
7. আকাশের নক্ষত্রের হিসাব গোপাল কিসে রেখেছিল?
8. গোপালের মুখে হিসাব শুনে নবাব কী করলেন?
9. নবাব হিসাব শুনে উজীরকে কী আদেশ করলেন?
10. বখশিশ নিয়ে গোপাল মুর্শিদাবাদ বাজারে গিয়ে কী করল?

বিস্তারিতভাবে উত্তর দাও

11. নবাবের উদ্ভট খেয়ালের কথা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গোপালকে জানাতে গোপাল কী উত্তর দিল? লেখো।
12. মুর্শিদাবাদে নবাবের দরবারে গোপাল কী কী নিয়ে কেমন করে হাজির হোল?
13. নবাবের দরবারে উপস্থিত হয়ে গোপাল যেভাবে পৃথিবীর মাপ ও নক্ষত্রের গণনার বর্ণনা দিয়েছে তুমি তা নিজের ভাষায় বিস্তারিতভাবে লেখো।
14. গোপাল বুদ্ধি খাটিয়ে যে অদ্ভুত হিসাব নবাবকে দিল তা পড়ে গোপাল সম্বন্ধে তোমার কী ধারনা হয়? যা বুঝেছ নিজের ভাষায় লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত অর্থের শব্দ লেখো–

অনর্থ	হেসে
উত্তর	শেষ

উপস্থিত	সবু
খারাপ	সোজা
বেশি	সত্যি

2. দুটি বর্ণ পাশাপাশি থাকলে অনেক সময় একসাথে মিলে একটি অর্থযুক্ত শব্দ তৈরি হয়। একে বলা হয় সন্ধি। যেমন : মিতা + আলি = মিতালি। স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের যোগ হলে তাকে বলা হয় স্বরসন্ধি। যেমন : মন + অন্তর = মনান্তর। নিচের শব্দগুলিকে এইভাবে আলাদা করে দেখাও–

বোঝাই	আমারি
চিন্তাকুল	কারো
শতেক	চারেক
তখনি	খানিক
এখনো	বড়াই

3. নিচে দেওয়া শব্দগুলি দিয়ে বাক্য তৈরি করো–

পৃথিবী	খেয়ালী
নক্ষত্র	গম্ভীর
আকাশ	চওড়া

আর একটি তারা

অন্নদাশংকর রায়

পাঁজিতে এক সুদিন দেখে
মহাশূন্যে চলেছে কে কে
রকেট চেপে দিচ্ছ কবে পাড়ি!
আমাকে ভাই, সঙ্গে নিয়ো
ইচ্ছে করে যাই আমিও
বানাই গিয়ে আসমানে এক বাড়ী।

এখানে আর যায় না থাকা
কোথাও নেই জায়গা ফাঁকা
গা মেলবার পা ফেলবার ঠাঁই।

রাস্তা ছিল তাও খোঁড়া
তলিয়ে যাবে গাড়ী ঘোড়া
মাঠ ছিল, তা দালানে বোঝাই।

মহাশূন্যে বানিয়ে ঘাঁটি
বাইরে করে হাঁটাহাঁটি
মাটি বিনাই মহাকাশচারী।
তাই যদি হয় চল না, ভাই,
ফুটবলটাও নিয়ে যাই
বিনা মাঠেই ছুটব পিছে তারই।

মহাশূন্যে খোলামেলা
মহানন্দে করব খেলা
পদে পদে বাধা দেবে কারা?
এখান থেকে হবে মনে
রাতের বেলা দূর গগণে
বাড়ী যেন আর একটি তারা।

জেনে রাখো

পাঁজি	–	পঞ্জিকা
সুদিন	–	সুন্দর দিন, ভাল দিন
মহাশূন্য	–	অনন্ত আকাশ
আসমান	–	আকাশ
দালান	–	বড় বাড়ি
ঘাঁটি	–	আস্তানা

মহাকাশচারী – মহাকাশে যে বিচরণ করে অর্থাৎ ঘুরে বেড়ায় যে

মহানন্দে – মহা আনন্দে,খুব আনন্দে

গগন – আকাশ

কাব্য পরিচয়

রকেটে চেপে মহাকাশচারীর মহাশূন্যে পাড়ি দেওয়ার ঘটনাটি ছোট কিশোরের মনে এক ইচ্ছে জাগিয়ে তোলে। পৃথিবীর এই মাটিতে তার চারপাশের পথ–ঘাট মাঠ সবই ধীরে ধীরে চলে গেছে গর্ত, খোঁড়াখুড়ি আর বিশাল বিশাল বাড়ির দখলে। তার খেলার মাঠটুকুও হারিয়ে গেছে। তাই বিনা মাটিতে মহাকাশচারীর মহাশূন্যে বিচরণের কথা শুনে তারও ইচ্ছে ওখানেই একটি বাড়ি বানিয়ে মাটি বিহীন বিশাল মাঠের মত মহাশূন্যে মনের আনন্দে বল খেলতে। কারণ, সেখানে তাদের খেলায় বাধা দেবারও কেউ নেই। রাতের বেলায় পৃথিবীর মাটি থেকে তার বাড়িটি অনেক তারার মাঝে আর একটি উজ্জ্বল তারার মত ফুটে উঠবে।

পাঠবোধ

ঠিক বাক্যের পাশে ✓ চিহ্ন দাও

1. আমাকে ভাই, সঙ্গে নিয়ো
2. ইচ্ছে করো যাও তুমিও
3. বানাও গিয়ে শহরে এক বাড়ি
4. মহাশূন্যে বানিয়ে ঘাঁটি
5. ঘরেই করো হাঁটাহাঁটি
6. মাটি বিনাই মহাকাশচারী

সংক্ষেপে উত্তর দাও

7. মহাশূন্য মানে কী?
8. মহাশূন্যে কীভাবে যাওয়া যায়?
9. আসমান শব্দটির অর্থ কী?

10. 'এখানে আর যায় না থাকা' এখানে বলতে কোথায়?

11. কিশোরটি মহাশূন্যে কী নিয়ে যাবে?

12. আকাশে 'আর একটি তারা' কী?

বিস্তারিতভাবে লেখো

13. মহাশূন্যে যাওয়ার ইচ্ছে কিশোরটির মনে কেন এলো? 'আর একটি তারা' কবিতা অবলম্বনে বুঝিয়ে লেখো।

14. 'আর একটি তারা' কবিতায় কিশোরটি মহাশূন্যে গিয়ে কী কী করতে চেয়েছে? কবিতাটি ভালো করে পড়ে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচে মহা শব্দটির সঙ্গে অন্য শব্দগুলি যোগ করলে যে শব্দ তৈরি হবে তা পাশে লেখো।

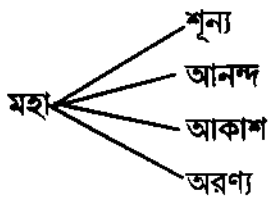

2. মানে বুঝে নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য রচনা করো

পাড়ি	ঘাঁটি
পারি	ঘাটি
তারা	ঘোড়া
তারা	ঘোরা
বাধা	
বাঁধা	

3. একটা বোঝালে একবচন হয় আর এটাকে অনেক করতে হলে রা, গণ, গুলি প্রভৃতি যোগ করা হয়ে থাকে। তাকে বলে বহুবচন। নিচের একবচনের শব্দগুলিকে বহুবচন করো: যেমন – গাছ–গাছগুলি

বাড়ি	গাড়ি
তারা	আমি
মাঠ	রাস্তা

4. বানানগুলি ঠিক করে লেখো

পাঁজী	মহাশূণ্য
সুদীন	ফূটবল
পাড়ী	মাটী

করতে পারো

সন্ধ্যা বেলায়, রাতে তোমরা আকাশে তারা দেখেছ। শক্ত কাগজ দিয়ে তারা বানিয়ে, রঙ দিয়ে তাকে রঙিন করে তোলো।

।। শহীদ–এ–ওয়তন পীর আলি ।।

বিদ্যুৎ পাল

বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা ছেলে। নিজের মুলুক থেকে এত দূরে, ধনী মানুষের দয়ায় বড় হওয়া ছেলে। ধুলো মাটিতে জন্ম নিয়ে, কুঠির অলিন্দে, দেউড়ির ছায়ায় ঘুরে দুনিয়া দেখতে শেখা ছেলে।

পীর আলি অন্যরকম হতে পারতেন। পাটনা বা আজিমাবাদ তখন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আফিস ব্যবসার কেন্দ্র। শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ডাচ, পর্তুগীজ, ইংরেজ বণিকেরা। আজকের গান্ধী ময়দান তখন সাহেবদের রেসকোর্স। পূবদিকে হাফ–নবাবী আর পশ্চিমে হাফ–সাহেবী শহরটায় অনেক প্রলোভন ছিল গা–ভাসানোর। গা–ভাসানো লোকগুলোর ঘাড়ে ভর দিয়েই তো চলছিল কম্পানির প্রশাসন।

কিন্তু কী যেন ছিল গঙ্গার বুক থেকে উঠে আসা হাওয়ায়। মন্দিরের বটের ঝুরিতে, অশ্বত্থের শিহরণে। মাজারের ওপর ঝরে পড়া কাঁঠালি চাঁপা ফুলগুলোর সুগন্ধে।

মাদ্রাসায় কত ছেলেই তো পড়ে। পীর আলি অক্ষর ধরে ধরে পৌঁছোতে চাইলেন হিন্দের হৃতকমলে। কেননা দেখতে পাচ্ছিলেন তার পাপড়িগুলোর ওপর বণিকতন্ত্রের ছায়া। যেন গায়কের ফুসফুসে আফিমের ছোপ।

পড়ে কী বুঝলে?

1. পাটনা বা আজিমাবাদে কারা কিসের ব্যবসা করত?
2. পাটনা শহরে তখন কারা ঘুরে বেড়াত?
3. হিন্দের কোন জিনিসের জন্য হুড়োহুড়ি পড়ত?

সোনার ভারত! তার আসল সোনা তো ছিল বুকের বল, মাথার স্পষ্টতা আর হাতের জাদু। তাই নিয়েই তো এ দেশ পৃথিবীর বাণিজ্য দখল করেছিল। হিন্দের কাপড়ের জন্য হুড়োহুড়ি পড়তো লিসবন, প্যারিসের বাজারে। হিন্দের ইস্পাত যেত ধারালো তরোয়াল হতে, দামাস্কাসে।

সে দেশের কী অবস্থা! রুগ্ন! হত দরিদ্র! হীন! সতেরো বছর বয়সে ভূমিকম্প দেখেছিলেন পীর আলি। ধেয়ে আসছে কড় কড় কান ফাটানো শব্দ, কাঁপছে পায়ের নিচে মাটি। সাত বছর বয়সে ছেড়ে আসা বাবা মায়ের কথা সেদিন খুব মনে পড়েছিল তাঁর।

কিন্তু পরে মনে হোত এর থেকে অনেক বড় কোনো এক ভূমিকম্পে ফাটল ধরে গেছে হিন্দের মর্মে। ধ্বসিয়ে দিয়েছে তার নৈতিক গঠন।

বুভুক্ষুর মত বই পড়তেন পীর আলি। পড়তে পড়তে কবে যেন সবাইকার চোখে তিনি বিদ্বান হয়ে উঠলেন! রাস্তায় পড়ে থাকা বাচ্চাটা হয়ে উঠল মওলানা পীর আলি খাঁ! উর্দু, আরবী, ফারসীতে সমান পারদর্শী।

কিন্তু পড়লেই তো শুধু হবে না. নিজের পায়ে দাঁড়াতেও তো হবে। পালক ধনী মানুষটি পিতার স্নেহ দিয়ে বড় করেছেন তাকে। কিছু দিন আগে যেমন নিজের ছেলের বিয়ে দিয়েছেন, পীর আলিরও বিয়ে দিয়েছেন ঘটা করে। সেই তাঁর কাছেই হাত পাতলেন শেষে। 'কিছু টাকা চাই, একটা বইয়ের দোকান দেব, ভাবছি।'

তখনও ছাপাখানা আসেনি এদিকে। তার ওপর উর্দু, আরবীর বই তো ছাপাখানা আসার পরেও বহু বছর অব্দি হাতে লেখাই চলেছে। শহরে বইয়ের দোকান গোনাগুনতি। পীর আলি নিজের দোকান সাজিয়ে তুললেন লক্ষ্ণৌ, দিল্লী থেকে বই আনিয়ে। পড়াও চলবে, রোজগারও চলবে।

নানান ধরনের মানুষ, যাঁরা পড়াশোনা জানেন, দেশ-দুনিয়ার খবর রাখেন, পীর আলিকে চিনে ফেললেন। কত রকমের প্রশ্ন যুবকটির মনে! কত চিন্তা করে সে! তাঁরা বলাবলি করেন নিজেদের মধ্যে। বই আনানোর সূত্রে দূরের সুহৃদ বন্ধু ও প্রিয়জনদেরও একটা বড় জগৎ গড়ে উঠল পীর আলির।

কিছুদিনের মধ্যে অদ্ভুত সব খবর আসতে শুরু করল চারদিক থেকে। উড়তে লাগল নানা ধরনের গুজব। ইংরেজ ফৌজের হিন্দুস্তানী সেপাইদের মধ্যে ফুঁসে উঠেছে অসন্তোষ। ওদিকে ঝাঁসী, গেয়ালিয়র, পূণা... আরো কত মুলুকের রাজা, রানীরা জোট বাঁধছে কোম্পানির বিরুদ্ধে। শহরের রাস্তায় যাওয়া আসা করা ইংরেজ অফিসারেরা যেন একটু সতর্ক।

– কে, বলল কে?

– হাজিগঞ্জে শেরশাহী মসজিদে এক ইমাম এসেছিলেন কলকাতা থেকে। তিনি বলেছেন।

– ব্যাপারীর বজরা যাচ্ছিল গঙ্গায়, গোয়ালন্দ থেকে এলাহাবাদ। দীঘা ঘাটে রসদ কিনতে থেমে নাবিকেরা বলাবলি করছিল।

– আরে, নটদের দল এসেছিল কানপুর হয়ে তারাই তো বলল!

–তোমরা জানোনা। দানাপুর ফৌজী ব্যারাকের বাইরে আর্দালী, খানসামাদের নতুন বস্তি উঠছে যে–ওখানেই একদিন গিয়ে শুনেছি।

শ্রীরঙ্গপত্তনে কবে যুদ্ধে প্রাণ দিল টিপু সুলতান– তার যুদ্ধডাক যেন সাড়া জাগিয়ে তুলেছে দেশে। পীর আলি তাঁর বইয়ের দোকানে বসে হঠাৎ, যেন সেই যুদ্ধডাক শুনে চমকে ওঠেন।

তিনি মনস্থির করে ফেলেন। এই সময় কবে থেকে তাঁর বুকে জমছিল গোরাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা! দেশটার মেরুদণ্ডে ঘূণ ঢোকাচ্ছে কোম্পানির শাসন। ... আজ সেই শাসন উৎখাৎ করার দিন এসে গেছে।

পড়ে কী বুঝলে?

1. পীর আলি কোন বয়সে বাড়ি ছেড়ে, পালিয়েছিলেন?
2. পীর আলি কোন কোন ভাষায় পারদর্শী?
3. ইংরেজ আমলে গান্ধী ময়দান কী ছিল?

নিজের যা কিছু উপার্জন, সব ঢেলে তিনি গোপনে গড়ে তুলতে শুরু করলেন বিদ্রোহীদের একটি দল। অস্ত্র যোগাড় করতে লাগলেন। নীল–সাদা রঙের বিদ্রোহের পতাকা ভাবলেন দলটির জন্য। কাছের দূরের বন্ধুদের সাথে চলল চিঠির আদান প্রদান– প্রস্তুতির আলোচনা। ক্যান্টনমেন্টে, ইংরেজ প্রশাসনে সম্পর্কসূত্র গড়ে তুললেন।

লক্ষ্ণৌএ এক মনের সাথী খুঁজে পেয়েছিলেন বইয়ের ব্যবসার সূত্রে। সেই সাথীর সাহায্যে স্ত্রী আর সন্তানদের লক্ষ্ণৌ প্রবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন।

চলতে লাগল প্রস্তুতি আর সময়ের প্রতীক্ষা।

1857 সাল। শুরু হোল উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সামরিক বিদ্রোহ। ভারতে ইংরেজ ফৌজের এক লক্ষেরও বেশি ভারতীয় সেপাই কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ফেটে পড়ল। ব্যারাকপুর থেকে মীরাট, দিল্লী, পেশোয়ার হয়ে তার ঢেউ আছড়ে পড়ল বিহারেও। বাবু কুঁঅর সিংএর বীরগাথা, দানাপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিদ্রোহী সেপাইদের নৌকায় করে পাড়ি দেওয়ার কাহিনী আজ সবাই জানে।

তেসরা জুলাই পাটনার কমিশনার উইলিয়াম টেলার একটু বেলায় খবর পেলেন যে পতাকা উড়িয়ে, হাতে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে কয়েকশো মানুষের একটা দল গুলজারবাগে সরকারি দপ্তরে হামলা চালাতে যাচ্ছে। আবার খবর পেলেন যে তারা গীর্জা ঘিরে নিয়েছে। প্রথম যে দলটা গেল স্থানীয় সেপাইদের তারা টিকতে পরলো না বিদ্রোহীদের সামনে। কিন্তু তারা সঠিক খবর নিয়ে এল যে পাটনা আফিম এজেন্সির ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তা ডেপুটি আফিম এজেন্ট ডা. লায়েলকে বিদ্রোহীরা নিকেশ করেছে। কমিশনার দানাপুর গ্যারিসন থেকে ব্রিটিশ সৈন্য চেয়ে পাঠালেন।

পড়ে কী বুঝলে?

1. রঙ্গপত্তনে কে যুদ্ধে প্রাণ দিল?
2. সবচেয়ে বড় বিদ্রোহ কত সালে শুরু হয়?
3. কমিশনার কোথা থেকে বৃটিশ সৈন্য চেয়ে পাঠালেন।

ইংরেজ সৈন্য আর ভারতীয় বশম্বদ সেপাইদের মিলিত শক্তি অবশেষে কাবু করল বিদ্রোহীদের। তখন প্রায় বিকেল। আকাশে আষাঢ়ের খন্ড খন্ড মেঘ। পীর আলি ডান হাতটা মুষ্টিবদ্ধ তুলছিলেন সাথীদের আহ্বান করে। তখনই মাস্কেটের গুলি লাগল বাঁ কাঁধে।

পরের দিন 21 জনের ফাঁসী হল। 23 জনকে জেলে পাঠানো হল। কমিশনার টেলারের নৃশংসতা সর্ববিদিত। তিনিও বিচলিত হয়ে পড়ে ছিলেন পীর আলির সামনে বসে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে।

পরবর্ত্তীকালে একটি বইয়ে তিনি লিখেছেন ঃ- ''ভারী শিকলে বাঁধা, বাঁ কাঁধের ক্ষত থেকে বেরুনো প্রচুর রক্তে তার নোংরা জামাকাপড় মাখামাখি, বাঁচার এক বিন্দু আশা নেই। তবু আমার ও অন্যান্য ইংরেজ ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখে এক মুহূর্তের জন্যেও উত্তেজনা, হতাশা কিম্বা ভয় খেললো না।

''তাকে প্রশ্ন করা হোল, এমন কিছু কি সে করতে চায়, যাতে তাকে জীবনদান দেওয়া যেতে পারে? সে পরম নিশ্চিন্ত ভাবে এবং ইষৎ অবজ্ঞার সাথে জবাব দিল, 'কখনো এমন সময় আসে যখন জীবন বাঁচানো ভালো। আবার এমন সময়ও আসে যখন জীবন খোওয়ানো ভালো।' (কমিশনার হিসেবে) আমি যে দমননীতি চালিয়েছি তাকে বিদ্রুপ করে শেষে বলল, ''আপনি আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারেন, আমার মত আরো অনেককে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারেন। কিন্তু আমার জায়গা নিতে হাজারো মানুষ

ছুটে আসবে। আপনার উদ্দেশ্য কখনোই সফল হবে না।..''

পাটনায় যেখানে পীর আলি এবং তার কুড়িজন সঙ্গীকে ফাঁসিতে ঝোলনো হয়েছিল সেখানে এখন একটি শিশু উদ্যান – 'শহীদ পীর আলি খাঁ স্মৃতি পার্ক'।

জেনে রাখো

শহীদ-এ-ওয়তন	–	দেশের শহীদ
ওয়তন	–	দেশ
কুঠি	–	ব্যবসায়ীর অফিস ঘর, ধনী ব্যক্তির অস্থায়ী বাসস্থান, বাংলো
অলিন্দ	–	বারান্দা
আজিমাবাদ	–	পাটনাকে আজিমাবাদ বলা হোত
ডাচ	–	নেদারল্যাণ্ডবাসীদের ডাচ বলে
বণিক	–	ব্যবসায়ী
রেসকোর্স	–	ঘোড় দৌড়ের মাঠ
হিন্দের হৃদকমলে	–	হিন্দুস্তানের হৃদয়পদ্মে
বণিকতন্ত্র	–	ব্যবসায়ী কর্তৃক শাসন ব্যবস্থা

তার পাঁপড়িগুলোর ওপর বণিকতন্ত্রের ছায়া – ইংরেজরা ব্যবসার সূত্রে ভারতে প্রবেশ করে। বণিকের মাপদন্ড হয়ে ওঠে শাসনের মানদন্ড। তারা কোমল হৃদয় ভারতীয়ের উপর অত্যাচারের ছায়া ফেলতে শুরু করে।

গায়কের ফুস্‌ফুসে আফিমের ছোপ – আফিম সেবন ধীরে ধীরে ফুস্‌ফুসের ক্ষতি করতে থাকে। মানুষ ক্ষয় রোগে (টি.বি) আক্রান্ত হয়। গায়কের ক্ষয় রোগ হলে সে যেমন আর গাইতে পারবে না, তেমনি ভারতবাসীর মধ্যে বিদেশীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ পীর আলি দেখতে পাচ্ছেন।

সোনার ভারত	–	ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ উজ্জ্বল ভারত
লিসবন	–	পর্তুগালের রাজধানী
দামাস্কাস	–	সিরিয়ার রাজধানী

প্যারিস	–	ফ্রান্সের রাজধানী
নৈতিক	–	নীতি সম্বন্ধীয়, ন্যায়সঙ্গত।
বুভুক্ষু	–	ক্ষুধিত, খাওয়ার ইচ্ছা।
পারদর্শী	–	নিপুণ, পটু
গোয়ালন্দ	–	বর্তমানে বাংলাদেশের নদী
নট	–	নর্তক, অভিনেতা (যারা নাচ,গান, অভিনয় করে)
শ্রীরঙ্গপত্তন	–	কর্ণাটক রাজ্যে অবস্থিত শহর।
গোরা	–	গৌরবর্ণ, ফরসা, ইউরোপীয় সেনা

দেশটার মেরুদণ্ডে ঘুণ ঢোকাচ্ছে কোম্পানির শাসন – দেশবাসীকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে ইউরোপীয় শাসক।

ঘূণ	–	এক ধরণের কাঠ ধ্বংসকারী পোকা
উৎখাত	–	সমূলে তুলে ফেলা, বিনাশ করা, দূর করে দেওয়া।
নিকেশ করা	–	ধ্বংস করা, শেষ করে দেওয়া
বশম্বদ	–	অনুগত, অধীন
সর্ববিদিত	–	সবাই জানে

পাঠ পরিচয়

1857 সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে সৈনিকরা বিদ্রোহ করে, যাকে সিপাহী বিদ্রোহ বলা হয়। বিদেশি শাসকদের অধীনতা থেকে ভারতীয়দের মুক্তি অর্জনের এই চেষ্টাকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়। এই সংগ্রামে পীর আলি নেতৃত্ব দেন। পীর আলি ছোটবেলায় বিদ্বান হবার স্বপ্ন দেখতেন। সেই স্বপ্নকে সফল করে তোলার জন্য বাড়ি থেকে পালান। উদ্দেশ্য লক্ষ্ণৌ, বেনারস বা পাটনায় বিদ্যা অর্জন করবেন। অনেক বাধা অতিক্রম করে পাটনা পৌঁছান। এখানে একটি বইয়ের দোকান দেন। তারপর ভারতীয়দের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যান। অবশেষে বিদ্রোহ শুরু হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেনি। ইংরাজরা কুড়িজন সঙ্গীর সঙ্গে তাঁকে ফাঁসি দেয়।

পাঠবোধ

সংক্ষেপে উত্তর লেখো

1. হিন্দের কাপড় কোন বাজারে যেত?
2. হিন্দের ইস্পাত কিসের জন্য কোথায় যেত?
3. কোন দেশের নিবাসীকে ডাচ বলা হয়?
4. 'এর থেকে অনেক বড় কোনো এক ভূমিকম্পে ফাটল ধরে গেছে হিন্দের মর্মে'। এ কোন এক বড় ভূমিকম্পের কথা বলা হয়েছে?
5. কোম্পানির বিরুদ্ধে কোথাকার রাজা, রানীরা জোট বাঁধলেন?
6. পীর আলি নিজের সব উপার্জন কিসে ঢেলে দিলেন?
7. পীর আলি তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদের কোথায় কার কাছে পাঠালেন?
8. পাটনায় যেখানে পীর আলি ও তাঁর সঙ্গীদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল সে স্থানটিতে এখন কী করা হয়েছে?

বিস্তারিতভাবে লেখো

7. বাড়ি থেকে পালিয়ে পীর আলি কীভাবে বিদ্বান হয়ে উঠলেন? রোজগার করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য কী করলেন?
10. দেশপ্রেমিক বিদ্রোহীদের উপর পাটনার কমিশনার উইলিয়াম টেলরের অত্যাচারের বর্ণনা 'শহীদ-এ-ওয়তন পীর আলি' পাঠ অবলম্বনে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত শব্দ লেখো

তখন	দরিদ্র
ওপর	শহর
সুগন্ধ	পশ্চিম

2. অর্থ লেখো

অলিন্দ	হিন্দের হৃতকমলে
বণিকতন্ত্র	বুভুক্ষু

ঠাণ্ডার গল্প

গিরিজাকুমার বসু

বিধু বলে–'আজকাল পাট্‌নায় সে কী শীত–
শুনে তুই একেবারে হোয়ে যাবি স্তম্ভিত।
ভোর বেলা উঠে দেখি, বুক, কাঁধ, ঘাড়, পিট্‌–
বরফেতে জমে গিয়ে হোয়ে গেছে ঠিক ইঁট্‌।'

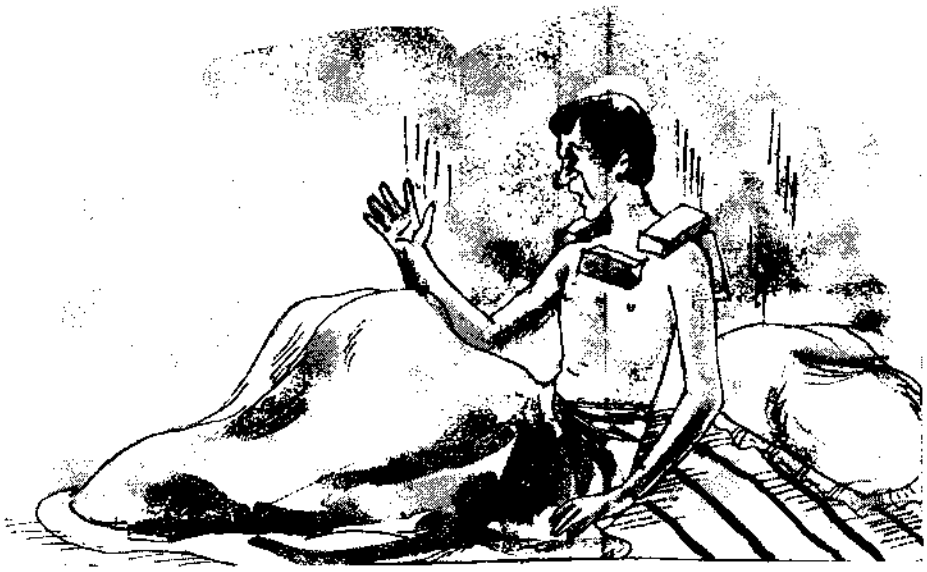

সিধু বলে–'ওতো ভারী,–আমাদের গ্রামটায়
ঠাণ্ডা যে কি রকম শুনে হবি চুপ ঠায়,
ঘুম ভেঙে ঘটি নিয়ে গিয়ে কাছে গাইটার
দুধ দুই যত দেখি এ আবার কী ব্যাপার,–
বিস্ময়ে সোজা হয়ে ওঠে গোঁফ, জুল্‌পী।
বাঁট থেকে ক্রমাগত বের হোলো কুল্‌পী।

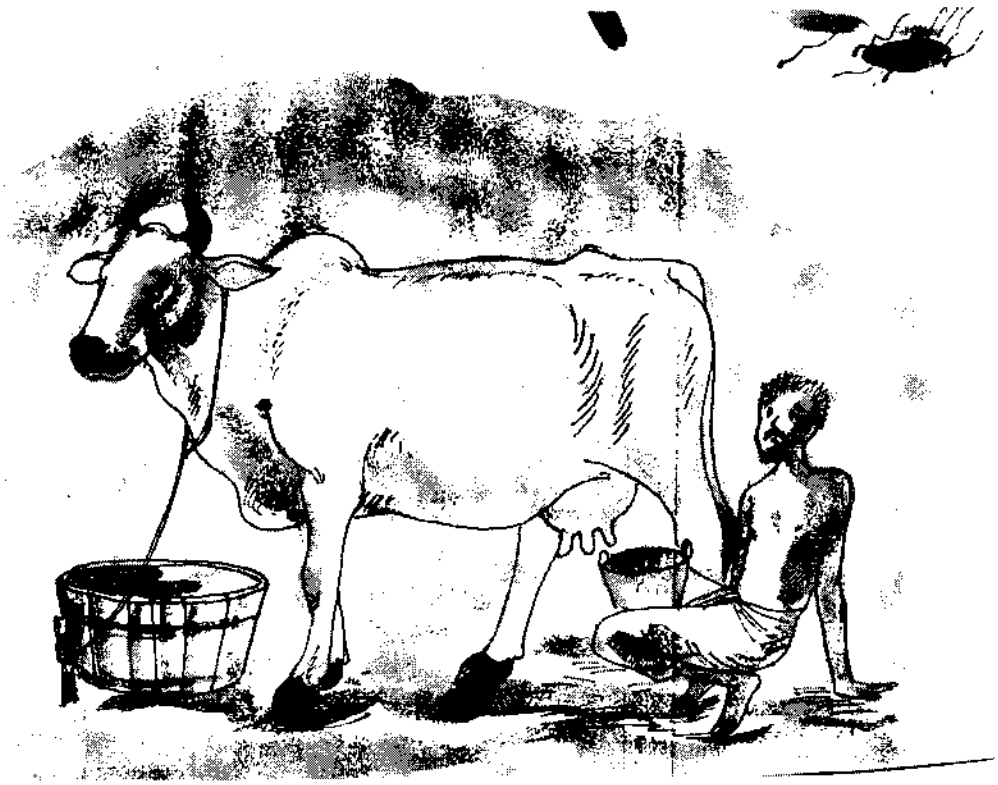

জেনে রাখো

স্তম্ভিত	–	অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ বা চুপ।
ঠায়	–	একটানা
জুল্‌পী	–	কানের পাশে রাখা চুল
ক্রমাগত	–	অবিরাম, একভাবে

কাব্য পরিচয়

দুই বন্ধু বিধু ও সিধু, অনেকদিন পর দেখা। দেখা হতেই বিধু পাটনার হাড় কাঁপানো শীতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলে বসল ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখে তার বুকে, কাঁধে, ঘাড়ে ও পিঠে প্রচন্ড ঠান্ডায় থান ইটের মতো বরফ জমে আছে। এই কথা শুনে সিধুও গল্পে কম যায় না। সেও শুরু করলো তাদের গ্রামে এমন ঠান্ডা পড়েছে যে ভোরবেলা গরুর দুধ দুইতে গিয়ে দেখে ঠান্ডায় গরুর বাঁট থেকে দুধ না বেরিয়ে কুল্‌পী বের হতে লাগল।

পাঠবোধ

ঠিক বাক্য দিয়ে খালি জায়গাটি ভরো

1. যেন পাথর, ঠিক্ ইট, থান ইট
   'বরফেতে জমে গিয়ে হোয়ে গেছে ....'।
2. ঠিক শব্দটি বসাও
   মোষটার, গাইটার, ছাগলটার
   'ঘুম ভেঙে ঘটি নিয়ে গিয়ে কাছে.....'।
3. আইসক্রিম, ক্ষীর, কুল্পী
   বাঁট থেকে ক্রমাগত বের হলো.....'।

অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও

4. বিধু কোথাকার শীতের কথা কাকে বলল?
5. সিধু কোন জায়গার ঠান্ডার কথা বলল?

বিস্তারিতভাবে লেখো

6. 'ঠান্ডার গল্প' কবিতাটিতে বিধু যে শীতের বর্ণনা করেছে জায়গার নাম উল্লেখ করে তুমি নিজের ভাষায় লেখো।
7. সিধু নিজের গ্রামের যে ঠান্ডার বর্ণনা করেছে 'ঠান্ডার গল্প' কবিতাটি পড়ে তার বর্ণনা তুমি নিজের ভাষায় লেখো।
8. কবিতার লাইনের শেষে দুটি শব্দের ধ্বনিগত মিল পাই
   যেমন–পিট, ইট্ কুল্পী, জুল্পী।
   এবারে তুমি নিচের শব্দগুলির মিল খুঁজে লেখো

চলো	আকাশ	ভোর	ঘটি	ভারি
.....	.....	.....	.....	.....

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচের শব্দগুলির বিপরীত শব্দ লেখো

ঠান্ডা	কাছে
গ্রাম	গাঁই
সোজা	শীত

2. বানান ঠিক করে লেখো –

সুনে	গোফ
ইট	ঘটী

করতে পারো

বিধু ও সিধু দুজনেই একে অপরকে বোকা বানানোর জন্য আজগুবি গল্প বলে, কিন্তু গল্পগুলি খুব মজার ও হাসির। এ ধরনের মজার আজগুবি গল্প বানিয়ে বানিয়ে দু–তিন লাইনের মধ্যে লিখতে পারো বা বন্ধুদের কাছে বলতে পারো।

রাজার মুখ

মীরা বালসুব্রমনিয়ম

অনেকদিন আগে গ্রীস দেশে এক রাজা ছিলেন, তিনি রাত্রিবেলা প্রায়ই ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন। ছদ্মবেশ নিয়ে গরীব প্রজাদের সংগে মিশে তাদের সুখদুঃখের কথা জেনে নিতেন ও সাধ্যমত তার প্রতিকার করতেন।

এক সন্ধ্যায় সেই রাজা এমনিভাবে ছদ্মবেশে শহরের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন– এমন সময় ভাঙাচোরা খড়ের কুটিরের ভেতর থেকে গানবাজনার আওয়াজ ভেসে এল। রাজা সেই কুটিরের দরজায় গিয়ে দেখলেন বেশ ক'জন লোক মিলে দোতারা বাজিয়ে গান করছে। রাজাকে দরজায় দেখে ওরা কোন প্রশ্ন না করেই তাঁকে আদর করে ঘরে ডেকে বসাল ও সামান্য কিছু খেতে দিল। তারপর রাজাকেও বলল তাদের গান বাজনায় যোগ দিতে।

বেশ কিছুক্ষণ ফুর্তি করার পর কুটিরের মালিক ছাড়া অন্য সবাই একে একে বিদায় নিল। রাজার অবশ্য তখনই যাবার ইচ্ছে ছিল না। ঘরের চারদিক দেখে উনি তখন বুঝে গিয়েছেন যে ঘরের মালিক বেশ গরীব। কিন্তু গরীব হয়েও তাঁর প্রজাটি কি ভাবে মনের শান্তি বজায় রেখে গানবাজনা করে চলেছে তাই জানতে চাইলেন উনি। জানতে চাইলেন লোকটি কী করে, কত রোজগার, কত খরচ, এই সব।

পড়ে কী বুঝলে?

1. রাজা কোন দেশে থাকতেন?
2. খড়ের কুটিরের লোকটি কী করে টাকা উপার্জন করতো?
3. কুটিরের মালিক রোজ কত টাকা রোজগার করতো?

লোকটি জবাব দিল–'আমি বেতের ঝুড়ি বুনে দিন গুজরান করি। ভগবানের দয়ায় আমার রোজ এক টাকা (গ্রীস দেশের টাকা অবশ্য) রোজগার হয়ে যায়। তার থেকে আমি পুরোনো ঋণ শোধ করি, ভবিষ্যতের জন্য সুদে টাকা খাটাই আবার দৈনিক আটজনের ভরণ পোষণ করি।'

রাজা অবাক হয়ে বললেন–'মাত্র এক টাকায় তুমি অত জিনিস করো কি করে বলবে? বিশেষ করে পুরনো ঋণ শোধ আর ভবিষ্যতের জন্য টাকা লগ্নীর ব্যাপারটা–ঠিক বুঝলাম

না।'

'এসো তোমায় দেখাচ্ছি'–বলে বাড়িওলা রাজাকে ভেতরে নিয়ে গেল। প্রথমে একটা ছোট ঘরে গেল ওরা। সেখানে ঝুড়িওলার বুড়ো মা বাবা শুয়েছিলেন। ওদের দেখিয়ে ঝুড়িওলা বলল–'এঁরা হচ্ছেন আমার মা বাবা। আমাকে জন্ম দিয়েছেন,–খাইয়ে পরিয়ে ছোট থেকে বড় করেছেন। আমি এখন ওদের খাইয়ে পরিয়ে সেই ঋণ কিছুটা শোধ করছি।'

এর পাশের ঘরটিতে খেলা করছিল চারটি ছোট ছোট ছেলে। ঝুড়িওলা ওদের দেখিয়ে বলল–'এরা আমার ছেলে। এদের খাইয়ে পরিয়ে বড় করার অর্থই হচ্ছে সুদে টাকা খাটানো–কারণ বড় হলে এরা আমায় দেখবে–বুড়ো বয়সে আমাকে খাওয়াবে পরাবে। আর আটজন প্রাণীর ভরণ পোষণের কথা বলছিলাম না? আমি আর আমার স্ত্রী, চার ছেলে, আমার মা বাবা, সব মিলে আটজন হোল কিনা? এক টাকায় চলা মুশকিল–তবে উপায় যখন নেই তখন কষ্টেসৃষ্টে চালাতেই হয়।'

রাজা বললেন–'দেখা যাচ্ছে তুমি শুধু সৎলোক নও, বুদ্ধিমানও বটে। এবার তোমাকে কিছু বলি এসো', এই বলে আত্ম পরিচয় দিলেন।

ঝুড়িওলা তো তখন ভয়েই অস্থির। বললে 'আপনার যথাযোগ্য সম্মান দিইনি,হুজুর, বেয়াদপি মাপ করবেন।'

'না, না, কোন বেয়াদপি করনি তুমি'– রাজা অভয় দিলেন তাকে। 'আর তোমার দুঃখ দূর করারও চেষ্টা করছি আমি। তবে একটা শর্তে। এক টাকা দিয়ে এতে সব করার কথা তুমি আমার মুখ না দেখলে অন্য কারুকে বোলোনা। যদি বলো, তাহলে কিন্তু তোমার মাথা কাটা যাবে।'

পড়ে কী বুঝলে?

1. ''দেখা যাচ্ছে তুমি শুধু সৎলোক নও বুদ্ধিমানও বটে''। কথাটি কে বলেছে? সৎ ও বুদ্ধিমান কে?
2. ঝুড়িওলা কেন ভয় পেয়ে অস্থির হোল?
3. রাজা ঝুড়িওলাকে অভয় দিয়ে কী বললেন?

'না, না, কাউকে বলব না'–জানালো ঝুড়িওলা। রাজা তখন ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

সেই সময় রাজসভায় প্রধানমন্ত্রীর পদটি খালি ছিল। রাজা চাইছিলেন সৎ বুদ্ধিমান লোককে ঐ পদে বসাবেন। তিনি তখন তাঁর অন্য সব কর্মচারী আর মন্ত্রীদের ডেকে বললেন–দৈনিক একটাকা দিয়ে কি করে একজন লোক পুরোনো ঋণ শোধ করে ভবিষ্যতের জন্য সুদে টাকা খাটায় অথচ আটজনের ভরণ পোষণ করে–এ সমস্যার উত্তর যে আমাকে দিতে পারবে তাকেই এ রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী করবো আমি। তিনদিনের মধ্যে এর উত্তর চাই।'

রাজ্যের সব কর্মচারী আর মন্ত্রীরা তৎক্ষণাৎ ভাবতে বসে গেলেন, কারণ প্রধানমন্ত্রী হবার ইচ্ছা সবারই আছে। কিন্তু পুরো দু'দিন ধরে ভেবে ভেবেও কোনই জবাব খুঁজে পেলেন না কেউ।

শেষে মন্ত্রীদের মধ্যে একজনের মনে হোল যে হয়তো রাজা ধাঁধা ও তার উত্তরটা কোনখান থেকে জেনে থাকবেন এবং সেটা রাজার ছদ্মবেশে ঘোরার সময়ই জানা সম্ভব।

সেই মন্ত্রীটি তখন সারা শহরের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছদ্মবেশী রাজার বর্ণনা দিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন যে ও ধরনের কেউ গত কদিনের মধ্যে এসেছিলেন কিনা।

সারাদিন ঘুরে সবখানেই নিরাশ হয়ে মন্ত্রীটি দিনের শেষে সেই ঝুড়িওলার বাড়ি এলেন।

মন্ত্রীর প্রশ্ন শুনে ঝুড়িওলা বলে উঠলো–'হ্যাঁ, আমাদের রাজা এসেছিলেন বৈ কি, এই গরীবের ঘরে পায়ের ধুলো দিয়ে গেছেন।'

মন্ত্রীটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন–'তুমি বোধহয় ওঁকে একটা ধাঁধা বলেছিলে না, এক টাকার সমস্যার কথা বললেন উনি।'

'হ্যাঁ বলেছিলাম'–

'উত্তরটাও নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে, বলবে আমায়?'

'আজ্ঞে, না'

মন্ত্রীটি সঙ্গে করে টাকার থলে নিয়েই এসেছিলেন। দু'শো টাকা বার করে বললেন –'এই টাকা দিচ্ছি,–এবার উত্তরটা বলো।'

'উহুঁ, কথা দিয়েছি, বলবো না।'

মন্ত্রী এবার পাঁচশো টাকা বার করে বললেন–'পাঁচশো দিচ্ছি, বলো। কেউ জানতে পারবে না।'

ঝুড়িওলা তবু রাজি হল না। মন্ত্রী এবার থলে উজাড় করে টাকা ঢেলে দিলেন। বললেন–'এক হাজার টাকা আছে এতে। পেলে অনেকদিন সুখে থাকতে পারবে, বলো জবাবটা।'

পড়ে কী বুঝলে?

1. ধাঁধার উত্তর জানার জন্য মন্ত্রী ঝুড়িওলাকে প্রথমে কত টাকা দিতে চেয়েছিল?
2. কত টাকা নিয়ে ঝুড়িওলা মন্ত্রীকে জবাব বলে দিল?
3. রাজা মন্ত্রীকে কেন বরখাস্ত করলেন?

চকচকে এক হাজার টাকা দেখে ঝুড়িওলা ভাবল–'এত টাকা পেলে আমার ছেলেরা অনেকদিন ভালো খেয়ে পরে বেঁচে থাকবে। এই ভাঙা বাড়িটাও সারানো যাবে। তার জন্য যদি আমার গর্দান যায়, না হয় গেল।'

টাকাগুলো উঠিয়ে ও মন্ত্রীকে জবাবটা বলে দিল। মন্ত্রী তো আনন্দে আটখানা হয়ে গিয়ে রাজাকে উত্তরটা জানালেন।

রাজা বুঝতে পারলেন যে ঝুড়িওলা ওর কথা রাখেনি। তক্ষুনি সেপাই পাঠিয়ে ঝুড়িওলাকে রাজসভায় আনালেন। ঝুড়িওলা এলে বললেন–'কী শর্ত হয়েছিল মনে আছে তো, এবার তোমার গর্দান যাবে।' তারপর সেপাইদের বললেন–'এর গর্দান নেওয়ার বন্দোবস্ত কর।'

ঝুড়িওলা কিন্তু ঘাবড়ায়নি একটুও। হাত জোড় করে বিনীত ভঙ্গিতে বললে–''হুজুর, আমি কিন্তু দোষী নই–'

'কি রকম?'

'শর্ত ছিল আপনার মুখ দেখতে পেলেই উত্তরটা বলতে পারবো। তাই তো করেছি'

'সে কি– আমার মুখ আবার দেখলে কখন?'

ঝুড়িওলা এবার টাকার থলেটা বার করল। বলল–'মন্ত্রীমশাই দিয়েছেন এগুলো। আপনার মুখ আছে এতে। একটা দুটো নয়, হাজারটা।' এই বলে একটা টাকা বার করে রাজার সামনে ধরল। রাজা দেখলেন টাকার পিঠে খোদাই করা ওঁর নিজেরই মুখ।

ঝুড়িওলা বললে–'খোদাই করা বটে, কিন্তু আপনারই মুখ তো। জবাবটা না বললে বেয়াদপি হতো হুজুর।'

রাজা এবার হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর সেপাইদের বললেন ঝুড়িওলাকে ছেড়ে দিতে। সেই মন্ত্রীটিকে বললেন–'ঘুষ দিয়ে জবাব আদায় করার অপরাধে এক্ষুনি বরখাস্ত হলে তুমি।'

তারপর ঝুড়িওলাকে বললেন–'তোমার মত বুদ্ধি খুব কম লোকেরই আছে। আজ থেকে তুমিই হলে আমার প্রধানমন্ত্রী।'

তারপর? ঝুড়িওলা প্রধানমন্ত্রী হয়ে মনের সুখে বাস করতে লাগল। বুদ্ধিমান আর সৎ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খুবই নামডাক হয়েছিল তার।

জেনে রাখো

ছদ্মবেশে	–	চেহারার রূপ বদল করে।
বেয়াদপি	–	অসভ্যতা
দিন গুজরান	–	(ফারসী শব্দ) দিন কাটানো, জীবনযাপন করা
বরখাস্ত	–	পদ থেকে সরানো
নামডাক	–	বিখ্যাত
ঋণ	–	ধার নেওয়া

টাকা লগ্নী	–	সুদে টাকা খাটানো
বিনীত	–	বিনম্র

পাঠবোধ

খালি জায়গায় ঠিক উত্তরটি লেখো:–

1. ক. লোকটি জবাব দিল – আমি.....(বাঁশের/বেতের) ঝুড়ি বুনে দিন গুজরান করি।
   খ. রাজা অবাক হয়ে বললেন – 'মাত্র..... (পাঁচ/এক) টাকায় তুমি অত জিনিস করো কি করে, বলবে?
   গ. 'এসো তোমায় দেখাচ্ছি'– বলে বাড়িওলা (মন্ত্রীকে/রাজাকে) ভেতরে নিয়ে গেল।
   ঙ. 'শর্ত ছিল আপনার.....(মুখ/রূপ) দেখতে পেলেই উত্তরটা বলতে পারবো।
   চ. রাজা বললেন–'ঘুস দিয়ে জবাব আদায় করার অপরাধে এক্ষুনি.....(বরখাস্ত/নিয়োগ) হলে তুমি'।
   ছ. রাজা বললেন – 'তোমার মত বুদ্ধি খুব কম লোকেরই আছে, আজ থেকে তুমিই হলে আমার.....(রাজমন্ত্রী/প্রধানমন্ত্রী)

সংক্ষেপে উত্তর দাও

2. রাজা ছদ্মবেশে গরীব প্রজাদের জন্য কী করতেন?
3. লোকটি ঝুড়ি বুনে যে টাকা রোজগার করতো তা দিয়ে কী কী করতো?
4. বাড়িওলা কী ভাবে সুদে টাকা খাটান, তা লেখো।
5. ঝুড়িওলার পরিবারে আটজন কারা কারা ছিল?

বিস্তারিতভাবে উত্তর দাও

7. রাজা ছদ্মবেশে খড়ের কুটিরের ভেতর গিয়ে কী দেখলেন, গুছিয়ে লেখো।
8. 'এর গর্দান নেওয়ার বন্দোবস্ত কর'–এই উক্তিটি কার? কার গর্দান নেওয়ার কথা বলা হয় এবং কেন? 'রাজার মুখ' গল্প অবলম্বনে লেখো।
9. রাজসভায় প্রধানমন্ত্রীর খালি পদটি ভরার জন্য রাজা কী উপায় অবলম্বন করেন?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. **ক্রিয়া পদের সঙ্গে বিশেষ্য ও সর্বনামের সম্বন্ধকে কারক বলে। কারক দুই প্রকার – কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ কারক।**

   নিচে চিহ্ন দেওয়া শব্দগুলির কারকের নাম লেখো ঃ–

   ক. চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে.....

   খ. মানুষকে অবিশ্বাস করো না.....

   গ. কালে শুনি.....

   ঘ. গৃহহীনে গৃহ দিনে আমি থাকি ঘরে.....

   ঙ. গাছ থেকে ঝড়ে আম পড়েছে.....

   চ. জলে মাছ আছে.....

2. **ঠিক বানানে (✓) চিহ্ন দাও ঃ–**

ছদ্মবেশে/ছদ্দবেশে	পোসন/পোষণ
ভবিষ্যত/ভবিষ্যৎ	রিণ/ঋণ

3. **তোমার স্কুলে তুলসীদাস জয়ন্তীতে গল্প বলার প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে চাও, এ বিষয় অনুরোধ জানিয়ে তোমার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে একটি পত্র লেখো।**

হঠাৎ যদি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আমায় যদি হঠাৎ কোন ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা
করি গোটা ক'য়েক আইন জারি
দু'এক জনায় খুব কষে দিই সাজা।

মেঘগুলোকে করি হুকুম সব
ছুটি তোদের, আজকে মহোৎসব।
বৃষ্টি–ফোঁটার ফেলি চিকন চিক
ঝুলিয়ে ঝালর ঢাকি চতুর্দিক,
দিল দরিয়া মেজাজ ক'রে কই
বাজগুলো সব স্ফূর্তি করে বাজা।

আমায় যদি হঠাৎ কোন ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

ওলট-পালট করি বিশ্বখানা
ভাঙি যেথায় যত নিষেধ মানা-
মনের মতো কানুন করি ক'টা
রাজা হওয়ার খুব ক'রে নিই ঘটা।
সত্য তা সে যত' বড় হোক
কঠোর হ'লে দিই তাহারে সাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোন ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

হাওয়ায় বলি, হল্লা ক'রে চল
তারার বাতি নিভিয়ে দলে-দল,
অন্ধকারে সত্যি কথার শেষে
রাজকন্যা পদ্মাবতীর দেশে।
ঘুমের পুরীর সেপাইগুলো ঢোলে
তাদের ধরে খুব ক'ষে দিই সাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

জেনে রাখো

সাজা	–	শাস্তি
মহোৎসব	–	মহা-উৎসব, বড় উৎসব
চিকন	–	সরু, পাতলা
চিক্	–	বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি পর্দা
ঝালর	–	কোঁচকানো কাপড়ের পাড়
চতুর্দিক	–	চারদিক
দিল দরিয়া	–	উদার
স্ফূর্তি	–	আনন্দ
নিষেধ	–	বারণ, মানা
কানুন	–	আইন
ঘটা	–	আড়ম্বর, আয়োজন
পুরী	–	রাজপ্রাসাদ, রাজবাড়ি

কাব্য পরিচয়

শিশু মনে হঠাৎ করে এক অদ্ভুত ইচ্ছে জেগে ওঠে। কেউ যদি তাকে একটি রাতের জন্য রাজা করে দেয় তবে প্রকৃতির আকাশ, বাতাস, মেগ, বৃষ্টির ওপর হুকুম জারি করবে। তাদের নিজের ইচ্ছে মত চালিত করে রাজা হওয়ার ইচ্ছে পূরণের সাধ মিটিয়ে নেবে। কখনও বা মেঘগুলোকে হুকুম করে ভীষণ গর্জনের সঙ্গে অঝোর ধারায় ঝরতে বলবে, কখনও বা হোয়াকে হুকুম করে তারা-ভরা রাতের আকাশ মেঘের চাদরে ঢেক দেয়ে আরও আঁধার করে তুলতে বলবে। এই আঁধার রাতে রূপকথার দেশে ঘুম-পাড়ানো সেপাইগুলো রাজকন্যার চোখে ঘুম না দিয়ে নিজেরাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এই অলস কাজ-না-করা সেপাইদের শাস্তি দিয়ে রাতের ঘুমকে ফিরিয়ে আনতে চায়। নিচে দেওয়া কবিতার লাইনগুলির মানে বুঝে নাও

"মেঘগুলোকে করি হুকুম সব

ছুটি তোদের, আজকে মহোৎসব।
বৃষ্টি-ফোঁটার ফেলি চিকন চিক
ঝুলিয়ে ঝালর ঢাকি চতুর্দিক,
দিল দরিয়া মেজাজ ক'রে কই
বাজগুলো সব স্ফূর্তি করে বাজা।''

শিশু যদি একরাত্রির রাজা হোত তবে আকাশের মেঘগুলোকে বর্ষার মহোৎসবে ছুটি দিয়ে দিত। ওদের বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়তে বলতো। আর সেই বৃষ্টির রূপ যেন মনে হবে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি চিকের পর্দা। আর, পৃথিবীর চারপাশে ছড়িয়ে পড়বে উৎসবে সাজানো ঝালরের মতো। এই সুন্দর আনন্দ উৎসবে মেঘের গর্জন যেন বাজনা হয়ে বেজে উঠবে।

পাঠবোধ

নিচের খালি জায়গায় ঠিক শব্দটি ভরো

সাজা, রাজা, কানুন, আইন, হল্লা, ঢোলে, বিশ্বখানা

1. আজকে রাতে কী হতে চায়?.....
2. গোটা কয়েক কী জারি করবে?.....
3. খুব কষে কী দেবে?.....
4. কী ওলট-পালট করবে?.....
5. মনের মতন কয়েকটা কী করবে?.....
6. হাওয়াকে কী করতে বলেছে?.....
7. ঘুমের পুরীর সেপাইগুলো কী করছে?.....

অতি সংক্ষেপে লেখো:

8. 'হঠাৎ যদি' কবিতাটি কার লেখা?
9. মেঘগুলোকে শিশুটি কেন ছুটি দিতে চেয়েছে?
10. 'হঠাৎ যদি' কবিতায় রাজকন্যার নাম কী?

সংক্ষেপে লেখো

11. হঠাৎ এক রাতের জন্য রাজা হতে পারলে, শিশুটি প্রথমেই কী করবে?

12. দিল দরিয়া মেজাজে কাজগুলোকে কী করতে বলা হয়েছে?

13. মেঘগুলোকে করি.....সব
    ছুটি তোদের আজকে.....।

বিস্তারিতভাবে লেখো

14. "বৃষ্টির ফোঁটার ফেলি চিকন চিক
    ঝুলিয়ে চাদর ঢাকি চতুর্দিক
    দিল দরিয়া মেজাজ করে কই
    বাজগুলো সব স্ফূর্তি করে বাজা।"
    'হঠাৎ যদি' কবিতার এই লাইনগুলির মানে সহজভাবে বুঝিয়ে লেখো।

15. এক রাতের রাজা হওয়া শিশুর মনের ইচ্ছাগুলি নিজের কথায় বিস্তারিতভাবে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. লিঙ্গ বদল করে লেখো

মহাশয়	কুমার
রাজকন্যা	সুন্দর
বুদ্ধিমান	রাজা

2. সন্ধি করো
    মহা + উৎসব
    পর + উপকার
    জ্ঞান + আলোক
    কারা + আগার

3. নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য তৈরি করো–

মেজাজ	অন্ধকার
আইন	বৃষ্টি
হুকুম	তারা

4. তোমাকে যদি একদিনের জন্য রাজা করে দেওয়া হয়, তবে তুমি কী কী করবে? মনের ইচ্ছেগুলোকে নিজের মতো করে গুছিয়ে লেখো।

করতে পারো

5. ক. শিশুমনে হঠাৎ নানারকম ইচ্ছে জেগে উঠতে পারে। রাজা হবার ইচ্ছে ছাড়া আরও যে সব ইচ্ছে তোমাদের মনে জাগে, সেগুলো নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারো।

খ. 'হঠাৎ যদি' কবিতার রাজার মতো রাজা হয়ে নিজেদের মনের ইচ্ছে অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করে দেখাও।

গ. কবিতাটি মুখস্ত করে আবৃত্তি করো।

কমল

রেবন্ত গোস্বামী

খাওয়ার পর মুখ ধুতে বসে কুলকুচি করে জল ফেলেই মাটির দিকে তাকিয়ে মঞ্জু চিৎকার করে উঠল, মা, কমলালেবুর গাছ বেরিয়েছে দেখবে এস।'

মা রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন। উত্তর দিলেন, 'পরে দেখব'খন। এখন ওদিকে মন না দিয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। ইস্কুলের বাস এসে যাবে।' কাজেই মঞ্জু তখনকার মত বৃক্ষচর্চা মুলতুবি রেখেই বইপত্র গোছাতে গেল।

কিছুদিন আগে মঞ্জুর যখন জ্বর হয়েছিল, তখন বাবা তার জন্যে রোজ কমলালেবু আনতেন। মঞ্জু সেই কমলা লেবুর বিচিগুলো সব জমিয়ে উঠোনের এই কোণটায় ফেলেছিল আর রোজ দুবেলা সেগুলোর ওপর জল দিত। যদিও এদিকটা জমাদারের ঝাঁট পড়ে না, তবুও মাকে বারবার এই ভাবী কমলা-বাগিচার কথা মনে পড়িয়ে দিতে ভুলত না মঞ্জু আর মাও জমাদার এলে বলতেন, 'দেখিস বাপু, মঞ্জুর কমলা-বাগানটা বাদ দিয়ে ঝাঁটি দিস।'

এতগুলো কমলালেবুর বিচি থেকে এতদিন পরে মাত্র একটি চারা জন্মাল কেন সেই রহস্য নিয়ে একটুও না মাথা ঘামিয়ে ঐ সবেধন নীলমণি চারাটির প্রতি মঞ্জু ভয়ঙ্কর রকম যত্ন আরম্ভ করল। ইস্কুল থেকে ফিরেই ঘটি ঘটি জল ঢেলে জায়গাটা কাদা করে ফেলল।

ডাক্তারখানা থেকে ফিরে মঞ্জুর ব্যাপারস্যাপার দেখে আর মার কাছ থেকে সব শুনে, বাবা বললেন, কি রে মঞ্জু, তুই কি মাছের চাষ করছিস যে অত জল ঢালছিস? আরে, ওর পূর্ব-পুরুষ হচ্ছে দার্জিলিঙের অধিবাসী। ওদের কি এত পুকুরে হাবুডুবু খাওয়া সহ্য হয়। নির্ঘাৎ দম বন্ধ হয়ে যাবে। তার চেয়ে ওকে দার্জিলিঙ মেলে চাপিয়ে ঘরের ছেলেকে ঘরে পাঠিয়ে দে।'

তিন-চারদিন পরেই গাছের চারাটার পাতাগুলো একটু কুঁকড়ে যেতে দেখেই বাবার কথাগুলো মঞ্জুর মনে হল। সত্যিই কি এখানকার আবহাওয়া কমলের সহ্য হচ্ছে না? চারাটির নাম মঞ্জুই কমল রেখেছে। বাবার কাছে শুনেছে গাছেরও মানুষের মত সুখদুঃখ আছে। তারা জন্মায়, খায়-দায়, আবার বুড়ো হয়ে মরেও যায়। তাছাড়া ঘুমায়ও। এই ত সেদিন সন্ধ্যেবেলা গাছের পাতা ছিঁড়লে মা ওকে বকে বলেছিলেন, 'ছিঃ, সন্ধ্যেবেলা গাছের পাতা ছিঁড়তে নেই, এখন গাছ ঘুমোয় না? মাকে সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'গাছ যখন জেগে থাকে তখন পাতা ছিঁড়লে কিছু হয় নাকি?'

পড়ে কী বুঝলে?

১. মঞ্জু কী দেখে চিৎকার করে উঠল?

২. মঞ্জু কমলালেবুর চারাটির কী নাম রেখেছিল?

৩. কমলালেবু গাছের পূর্ব-পুরুষ কোথাকার অধিবাসী?

মা হেসে বলেছিলেন, 'বিনা কারণে কখনোই গাছকে কষ্ট দেবে না। ওদের বুকেও ভগবান আছেন।

গাছের বুক কোনটা অনেক চিন্তা করেও ঠিক করতে পারল না মঞ্জু। পারলে বাবার বুক্ দেখা নলটা লাগিয়ে কমলের বুকটা একবার দেখে নিত।

তারপর ভাবল, বাবার কথা সত্যি হতেও পারে। যদিও কমল তাদের উঠোনে জন্মেছে, কিন্তু তার পূর্বপুরুষ ত সকলেই দার্জিলিঙের। সেই দেশের আবহাওয়াতে হয়ত সে আরো আরাম পেত।

যেমন ছোট মাসির মেয়ে রিঙ্কি আমেরিকায় জন্মেছে, কিন্তু ছোট মাসি চিঠিতে লিখেছে যে সে দিদার পাঠানো আমসত্ত্ব আর বড়ি খেতে খুব ভালবাসে। অথচ কে না জানে ওদেশের ছেলেমেয়েরা দিনরাত শুধু কেক খেয়ে থাকে।

হঠাৎ মঞ্জুর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যেতে নিজের মনেই সে হাততালি দিয়ে উঠল। দার্জিলিঙে সে না গেলেও বাবার কাছে শুনেছে যে সেটা পাহাড়ের ওপরে। চারিদিকে শুধু পাথর। অবশ্য অনেক ওপরে-উ-ই যেখানে মেঘ ভেসে যাচ্ছে। অত ওপরে এরোপ্লেন, চিল আর গ্যাস-বেলুন ছাড়া আর কিছুই উঠতে পারে না। তা হ'ক, তবু ত পাথরের পাহাড় সে করতে পারবে। সরস্বতী পূজোর সময় তারা ত পাহাড় তৈরি করেছিল ইট, কাদা আর ঘাসের চাবড়া দিয়ে।

রবিবার দিন মঞ্জুর সারা সকাল কাটল বাগানের এককোণে একটা পাহাড় তৈরি করতে। দুপুরে খেতে বসে মাকে জিজ্ঞেস করল, 'মা, গোবিন্দমামার সঙ্গে আজ একটু স্টেশনে বেড়াতে যাব?'

মা বললেন, 'কেন, হঠাৎ স্টেশনে যাওয়ার কি হল?' কিন্তু গোবিন্দমামার সঙ্গে যাবে শুনে তেমন আপত্তি করলেন না।

বিকেলে মঞ্জু রেল লাইন থেকে পাথর তুলে তার জামা আর প্যান্টের পকেটগুলো এমনভাবে ভর্তি করল যে সেগুলো প্রায় ছিঁড়ে যাবার মত হল। তখন আর কিছু পাথর

গোবিন্দমামাকে দিয়ে বলল, 'গোবিন্দমামা, এগুলো ধর ত। বাড়ি গিয়ে আমাকে দেবে। এখন বাড়ি চল।' এই বলে হতভম্ব- গোবিন্দমামাকে প্রায় টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে এল।

পরদিনই রেলপথের পাথরগুলো কর্দম-ইষ্টক-নির্মিত ক্ষুদ্র পাহাড়টিকে শোভিত করল। আর মুমূর্ষু কমলকে আগের জায়গা থেকে সরিয়ে সেই পাহাড়ের চূড়ায় তেনজিং-এর পতাকার মত আবার প্রতিষ্ঠিত করল মঞ্জু।

কিন্তু হায়! মঞ্জুর চিকিৎসা ব্যর্থ করে দুদিনের মধ্যেই কমল একেবারেই নুইয়ে পড়ল। তার পাতাগুলো শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। যখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করার কোন উপয়াই থাকল না, তখন মঞ্জু কেঁদে ফেলল।

মা বললেন 'কিসের না কিসের গাছ। ওটা যে কমলা গাছ তার ঠিক কি? আর তাছাড়া এত নাড়াচাড়া করলে কি গাছ বাঁচে? শেকড় ছিঁড়ে গেছে হয়ত। কিংবা পোকাও লাগতে পারে। এমন কাঁদছে যেন পোষা কুকুর বেড়াল মরেছে।'

বাবা কলে বেরোচ্ছিলেন, বললেন, 'ওরকম হয়। গাছ হলে কি হবে, কমল ত মঞ্জুরই পোষ্যপুত্র ছিল। আসলে যেখানকার গাছ সেখানকার আবহাওয়া ছাড়া বাঁচা কঠিন। আমি ত নিজে আঙুরগাছ লাগিয়েছিলাম। কটা ফল হয়েছিল? এরা ত মানুষ নয় যে লঙ্কায় গেলে রাবণ হয়ে বসবে।' এই বলে বাবা বেরিয়ে গেলেন।

মঞ্জুর মনে হল হয়ত বাবার কথাই ঠিক। কমল হয়ত দিনরাত দার্জিলিঙের কথা ভেবে মন খারাপ করত। তাই তার অসুখ সারল না।

বিকেলে মার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে সে খেলতে চলে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল একটা বেলুন নিয়ে।

মা যখন রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত, সে তখন গ্যাসবেলুনটার সুতোর সঙ্গে শুকনো চারাগাছটাকে বাঁধল। তারপর আস্তে আস্তে সুতোটাকে ছেড়ে দিল শূন্যে। যতক্ষণ না বেলুনটা আকাশে ছোট হতে হতে একেবারে মিলিয়ে গেল, ততক্ষণ সে চেয়ে রইল সেদিকে।

পড়ে কী বুঝলে?

1. 'গাছের পাতা ছিঁড়লে কিছু হয় নাকি'। এই প্রশ্নের উত্তরে মঞ্জুর মা কী বললেন?
2. রবিবার দিন মঞ্জুর সারাটা সকাল কীভাবে কাটল?
3. সরস্বতী পূজার সময় মঞ্জুরা কী দিয়ে পাহাড় তৈরি করত?

অন্ততঃ কমলের মরদেহটা ঐ মেঘেদের সঙ্গে দার্জিলিঙের চেনা পৃথিবীতে ফিরে যাবে–এই ভেবে মঞ্জু ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল।

জেনে রাখো

বৃক্ষচর্চা	–	গাছপালার সেবা
মুলতুবি	–	স্থগিত, থামিয়ে দেওয়া
অধিবাসী	–	কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী মানুষ
নির্ঘাৎ	–	নিশ্চিতভাবে
মুমূর্ষু	–	মৃতপ্রায়, যে মারা যাচ্ছে

কর্দম	–	কাদা
ইষ্টক	–	ইঁট
নির্মিত	–	তৈরি করা
ক্ষুদ্র	–	ছোট
পুনরুজ্জীবিত	–	পুনরায় জীবিত
পোষ্যপুত্র	–	নিজের ছেলে নয় অথচ ছেলের মত যাকে লালন পালন করা হয়

পাঠবোধ

1. ঠিক উত্তর বেছে খালি জায়গায় ভারো ঃ-

(অধিবাসী, বৃক্ষচর্চা, পূর্ব-পুরুষ আঙুরগাছ, চিল, হাবুডুবু)

ক. মঞ্জু তখনকার মত.....মুলতুবি রেখেই বইপত্র গোছাতে গেল।

খ. ওর.....হচ্ছে দার্জিলিং-এর.....।

গ. অত ওপরে এরোপ্লেন.....আর গ্যাস বেলুন ছাড়া আর কিছুই উঠতে পারে না।

ঘ. ওদের কি এত পুকুরে.....খাওয়া সহ্য হয়?

ঙ. আমি ত নিজে.....লাগিয়েছিলাম।

সংক্ষেপে উত্তর লেখোঃ-

2. চারাগাছটিতে মঞ্জুর ঘটি ঘটি জল ঢালা দেখে তার বাবা কী বলেছিলেন?
3. গাছের সঙ্গে মানুষের কী কী মিল আছে?
4. মা গাছের পাতা ছিঁড়তে কেন মানা করেছিলেন?
5. মঞ্জু কী দিয়ে পাহাড় তৈরি করলো?
6. পাহাড়ের চূড়ায় কীসের মতো চারাগাছটিকে দাঁড় করালো?
7. মঞ্জু গ্যাস বেলুনের সুতোর সঙ্গে চারাগাছটি বাঁধল কেন?

বিস্তারিতভাবে উত্তর দাও

৪. কমলালেবুর গাছটিকে কেন মঞ্জু পাহাড় তৈরি করে বসাতে চাইল আর এই পাহাড় তৈরি করার জন্য সে কী আয়োজন করলো?

9. 'গাছ হলে কি হবে, কমল ত মঞ্জুরই পোষ্যপুত্র'– এ কথাটি কে কাকে বলেছেন আর মঞ্জুরই পোষ্যপুত্র কেন বলা হয়েছে?

10. কমল কেন শেষ পর্যন্ত বাঁচলো না? মঞ্জু তার জন্য কী করছিল? বুঝিয়ে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বাক্য তৈরি করো–

ক. নির্ঘাৎ ঃ.....

খ. ক্ষুদ্র ঃ.....

গ. অসুখ ঃ.....

ঘ. পোষ্যপুত্র ঃ .....

ঙ. প্রতিষ্ঠিত ঃ.....

চ. অধিবাসী ঃ.....

2. লিঙ্গ বদল করো ঃ–

মামা	ছেলে
বাবা	মামি
পোষ্যপুত্র	

3. নিচের বানাগুলি ঠিক করে লেখো–

তারাতারি	ইস্টক
পোস্যপুত্র	সন্ধেবেলা
ব্যস্ত	অধীবাসি

4. লক্ষ্য করো, নিচে দুটি শব্দ যোগ করে একটি করা হয়েছে, আলাদা আলদা করে লেখো।

পূর্বপুরুষ	ছেলেমেয়ে
ইষ্টকনির্মিত	কমলবাগিচা
দিনরাত	রেলপথ

5. ক. 'চোখ' বিশেষ্য পদটির সঙ্গে অন্য শব্দ যোগ করে দুটি অর্থপূর্ণ শব্দ লেখো – যেমন চোখ টেপা

   খ. 'ছোট' বিশেষণ পদটির সঙ্গে অন্য শব্দ যোগ করে দুটি অর্থপূর্ণ শব্দ লেখো– ছোট বেলা

করতে পারো

তোমরা হয়তো জানো সব ধরনের গাছ সব মাটিতে হয় না, আবার আবহাওয়ার উপরও নির্ভর করে। আমগাছ যেমন শীতের দেশে হয় না. তেমনই শীতের দেশের ফল কমলালেবু জোর করে ফলানোর চেষ্টা করলে তা পন্ডশ্রম হবে সে কমলা খাওয়ার উপযুক্ত হবে না। তাই তোমরা যেখানে থাকো সেখানকার মাটিতে যে ফুল–ফল, শাক–সব্জি ইত্যাদি হয় তা বড়দের কাছে জেনে নিয়ে লাগাও ও যত্ন করে বাঁচাও।

সুলতান

শৈলেন ঘোষ

তার নাম সুলতান। একটি ছোট্ট ছেলে। সুলতানকে যদি দেখতে চাও, তোমাকে যেতে হবে অনেক দূরে। অনেকটা পথ রেলগাড়ি চেপে। অনেক নদী ডিঙিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে। সেই পাহাড়ে দাঁড়িয়ে চিনার গাছের আড়াল থেকে তুমি যদি চোখ মেলে ওই দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাক, তোমার তখন ঠিক নজরে পড়বে সেই বরফের ওপর। বরফ, পাহাড়ের মাথায়। সূর্যের আলো পড়েছে। বরফ গলছে। নেমে আসছে নিচে। কোথাও সে নদী। কোথাও বা ঝরনা। চলো না, ওই ঝরনার ধারে যাই। উহুঁ। বললেই তো আর ওখানে যেতে পারবে না. পাহাড়ের উঁচু-নিচু পাথর ডিঙিয়ে অনেকখানি চড়াই-উৎরাই করতে হবে তোমাকে। তারপর তুমি পাহাড়ের গায়ে দেখতে পাবে কত কুঁড়েঘর। ওইখানেই সুলতান থাকে। সুলতানের আম্মা, আব্বা। ওদের একটা ঘোড়াও আছে। সুলতানের আব্বা রোজ ঘোড়া নিয়ে শহরে যায়। এই পাহাড়ি-দেশে দূর-দুর দেশ থেকে কত মানুষ বেড়াতে আসে। পাহাড়ের ওপরে একটা নীলহ্রদ আছে। তারা দেখতে যায়

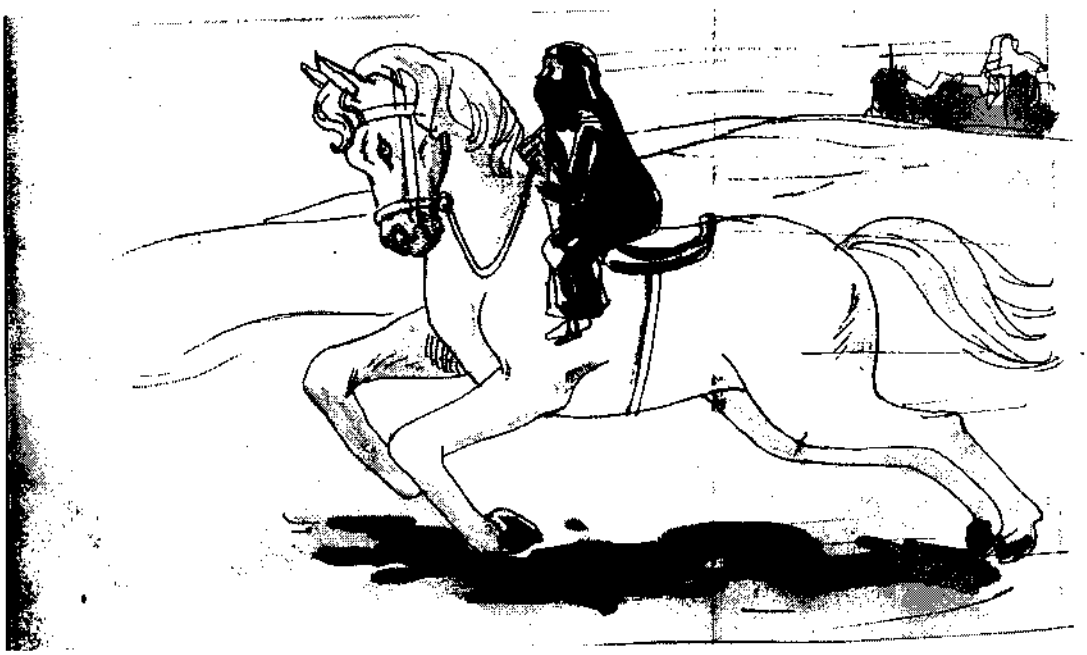

সেই হ্রদ। ঘোড়া ছাড়া সেখানে তো যাওয়া যায় না। আরও অনেক ঘোড়াওলার মতো সুলতানের আব্বাও দূর দেশের যাত্রীদের নীলহ্রদের দৃশ্য দেখতে নিয়ে যায় তার ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে। পয়সা নেয়। তাতেই তাদের চলে যায়।

সুলতানকে কী সুন্দর দেখতে। ডাগর-ডাগর চোখ। তেমনি গায়ের রঙ। গালদুটি পাকা আপেলের মতো টুকটুক করছে। টোঁট দুটিতে হাসি উপচে পড়ছে। কিন্তু এই দুরন্ত শীতে বেচারির যে-জামাটা গায়ে আছে,তাতে যে শীত কতটা মানছে, তা সে ওই-জানে। তা হোক, তবু শীতকে সুলতান একটুও ভয় পায় না। এই শীতের সকালে সুলতান রোজ পাহাড়ের পাথরে পাথরে লাফ দিয়ে ওই ওপর থেকে নেমে আসে নীচে। ফারগাছের বনে. আনন্দে চিৎকার করে গান গায়। তারপর হাওয়ায়-দোলা ফারগাছের পাতার মতো ছটফটিয়ে ঝরনার ধারে ছুটে যায়। সেখানো ওর বন্ধু কাশিম ভেড়া চরায়। তার সঙ্গে কত গল্প করে। আর যে-ভেড়াটা এইটুকুনি ছোট্ট, তাকে কোলে নিয়ে এমন আদর করে যে, সে আর কোল থেকে নামতেই চায়না।

একদিন হল কী, সুলতানের আব্বাজানের খুব জ্বর হল। জ্বরের আর দোষ কী! সেই কোন্ সকালে উঠবে মানুষটা। ঘোড়াকে ছোলা-দানা খাইয়ে বেরিয়ে পড়বে শহরে। ফিরবে সেই সাঁঝের বেলা। হল-হল, তা এমন হল জ্বর ছাড়তেই চায় না। ঘরে যা পয়সা ছিল তা-ও প্রায় শেষ। অগত্যা ডাক পড়ল সুলতানের।

"সুলতান!" আব্বাজান জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে ডাক দিল সুলতানকে।

"কী?" সুলতান ছুটে এল আব্বাজানের কাছে।

"তোকে শহরে যেতে হবে। আমার মতো ঘোড়ার পিঠে যাত্রী নিয়ে তোকে পয়সা উপায় করে আনতে হবে। পারবি না?"

সুলতানের গায়ে কাঁটা দিল। এ যে স্বপ্ন। সে যে কতদিন এই স্বপ্নই দেখেছে। সে যে কতদিন শহরে যেতে চেয়েছে। কিন্তু পারেনি। আব্বা তাকে নিয়ে যায়নি। আর আজ আব্বাই তাকে শহরে যেতে বলছে। আনন্দে সুলতান চিৎকার করে উঠল, "আব্বাজান, আমি পারব, নিশ্চয়ই পারব।"

সুলতানের খুশি-ঝলমল মুখখানি দেখে আব্বার চোখদুটি ছলছল করে উঠল। ছেলের চিবুকটি একটু ছুঁয়ে আদর করে বলল, "আমি জানি তুই পারবি। তুই যে আমার ছেলে।"

পরেরদিন আব্বার মতো খুব সকাল-সকাল উঠে সুলতান ঘোড়াকে ছোলা-দানা খাওয়াল। গায়ে সে ছেঁড়া পশমি কোটটা চড়িয়ে, ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটা দিল। পিঠে চাপল না। কষ্ট হবে যে ঘোড়ার। সে কোনোদিন তার আব্বাজানকেও দেখেনি ঘোড়াকে কষ্ট দিতে। সুলতানের আম্মা ছেলের জন্য কটা রুটি, একটু তরকারি করে রেখেছিল। রুটি-তরকারি সঙ্গে নিল সুলতান। তারপর আম্মার বুকে মাথা রেখে, একটু আদর করে হাঁটা দিল।

পড়ে কী বুঝলে?

1. কুঁড়ে ঘরে সুলতান ছাড়া আর কে কে থাকতো?
2. সুলতানের সঙ্গে আম্মা কী দিয়েছিল?
3. যাত্রীদের ঘোড়ায় চড়িয়ে কে বেড়াতে নিয়ে যায়?
4. সুলতানকে ঘোড়া নিয়ে আসতে দেখে সবাই মুখ টিপে কেন হাসছিল?

অনেকটা হাঁটার পর শহরের পথে পা দিল সুলতান। আকাশে এখন রোদের ছড়াছড়ি। রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একটি-দুটি মানুষও এবার নজরে পড়ছে। কেউ সুলতানকে দেখে অবাক হচ্ছে। কেউ-কেউ মুখ টিপে হাসছে। হাসবারই কথা। ওইটুকু একটা পুঁচকে ছেলে অত বড় একটা ঘোড়া নিয়ে কেমন গুটি-গুটি হেঁটে চলছে।

হাঁটতে হাঁটতে শহর এসেই পড়ল। পাহাড়-ঘেরা ছোট্ট শহর। এখানে কত মানুষ। কত দোকান। কত রকমের পসরা। চোখ জুড়িয়ে যায়। রাস্তার ধারে একটা উইলো গাছের নিচে একটু বসল সুলতান। তার বাড়ির থেকে শহর তিন ঘন্টার পথ। একটু তো কষ্ট হবেই। আম্মা যে রুটি কটা দিয়েছিল, খেয়ে নিল। ঘোড়াটাও আপনমনে ঘাস চিবুতে শুরু করে দিয়েছে। খাওয়া শেষ হতেই সুলতানের মনে হল, তাই তো, এবার সে কী করবে! সেই নীলহ্রদ কোন পথ দিয়ে যেতে হয়, কোথায় নীলহ্রদের যাত্রী মিলবে, সে তো কিছুই জানে না। তাই বলে এমনি করে বসে থাকলে তো চলবে না। সে উঠে দাঁড়াল। ঘোড়ার লাগাম ধরে বেশ খানিকটা হাঁটতেই কেমন যেন শোরগোল শুনতে পেল সুলতান। কোনদিক থেকে আসছে গোলমালটা। মনে হচ্ছে ওইদিক থেকে আসছে। সেইদিকেই পা চালাল।

ঠিক তাই। একটু যেতেই চৌরাস্তার মোড়। হ্যাঁ সামনেই বাজার। আর ওই দ্যাখো, ওইদিকে তারই মতো কত লোক ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাঁক দিচ্ছে, "নীলহ্রদ যাবে, নীলহ্রদ।"

আর দেখতে হয়, সুলতান কী খুশি! সে ঠিক বুঝতে পেরেছে, ওইখানে দাঁড়িয়ে তাকেও ওদের মতো ডাক দিতে হবে। ঠিক তাই, সে-ও ওইখানে পৌঁছে হাঁকতে শুরু করে দিল "নীলহ্রদ যাবে, নীলহ্রদ।"

আর যায় কোথা! ওখানে ঘোড়া নিয়ে ওই যে লোকগুলো যাত্রী খুঁজছিল, একটা বাচ্চা ছেলের গলা শুনে চমকে তাকাল তার দিকে। সুলতানকে দেখে তারা যেন জ্বলে উঠল। ভাবল, ছেলেটা কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল। তাদের খদ্দের ভাঙিয়ে নিচ্ছে! একজন তেড়েমেড়ে এগিয়ে এসে কড়কে উঠল, "এই পুঁচকে এখানে কী করছিস? হাট এখান থেকে।" সুলতান দেখল সবাই তার চেয়ে বড়। তাই হাসিমুখে নরম গলায় উত্তর দিল, "আমার আব্বাজান এখানে রোজ আসে। খুব অসুখ আমার আব্বাজানের। আজ আসতে পারেনি। তার বদলে আমি এসেছি। আমার আব্বাজানের নাম ওসমান।"

পড়ে কী বুঝলে?

1. বাজারে ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে লোকেরা কী বলে হাঁকতে শুরু করলো?
2. অন্য ঘোড়াওয়ালারা সুলতানকে দেখে কেন চটে উঠলো?
3. মারতে আসা অন্য ঘোড়াওয়ালাদের হাত থেকে কে সুলতানকে বাঁচালো?
4. ভিনদেশী যাত্রীটির সুলতানকে দেখে কেন ভালো লাগল?

অন্য আর একটা লোক খিকিয়ে উঠল আমরা ওসব ওসমান-টোসমান কাউকে চিনি না। এটা মগের মুল্লুক নাকি। যে আসবে সে-ই কারবার চালু করে দেবে। যা ভাগ এখান থেকে! বেশি ঝামেলা করিস না। কথা না শুনলে এই দেখছিস।" বলে লোকটা ঘোড়া ঠেঙাবার চাবুকটা ওর দিকে তুলে দেখাল।

চাবুক দেখেই সুলতানের মেজাজ গেল বিগড়ে। কী, তাকে চাবুক দেখিয়ে শাসানো। থাকতে পারল না সুলতান। সে-ও তেমনি চড়া-গলায় বলে উঠল, এইটা কি তোমাদের কেনা কাজের জায়গা? আমিও এখানে দাঁড়িয়ে যাত্রী ডাকব। দেখি আমাকে কেমন করে চাবুক মারো।" বলে সুলতান খুব জোরে-জোরে হাঁক দিতে লাগল, "নীলহ্রদ যাবে, নীলহ্রদ।"

সঙ্গে সঙ্গে সুলতানকে একধাক্কা মেরেছে সেই লোকটা। সুলতান অতবড় একটা ধুমসো লোকের ধাক্কা, কখনও সামলাতে পারে? ছিটকে পড়ে গেল। পড়েই মুহূর্তে উঠে পড়েছে। ছুটে গিয়ে একেবারে লোকটার বুকের ওপর ধাঁই করে একখানা ঘুষি চালিয়ে দিয়েছে। লোকটা ঘুষি খেয়েই সুলতানের গলাটা টিপে ধরল। এই বুঝি সুলতানের দম আটকে যায়। অমনি তার সঙ্গীরা হম্বিতম্বি লাগিয়ে দিল, "মার, মার।"

ঠিক সেই সময়, তাই দেখে, একজন ভিনদেশী যাত্রী ছুটে এসে সুলতানকে ছাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "আচ্ছা লোক তো তোমরা, বাচ্ছাটাকে মেরে ফেলবে নাকি!"

লোকটা উত্তেজনায় হাঁপাতে-হাঁপাতে চেঁচিয়ে উঠল, "মারব, আলবত মারব! কালকের ছেলে আমার গায়ে হাত তোলে! একদম খতম করে ফেলব।"

যাত্রীটি বললেন, "আরে ভাই তুমিই তো একে আগে ঠেলে ফেলে দিলে।"

"ও এখানে দাঁড়াবে কেন?" লোকটা রাগে গর্জে উঠল।

"বেশ করব।" সুলতানও চেঁচিয়ে উঠেছে, "আমার আব্বাজান রোজ এখানে ঘোড়া নিয়ে আসে। আমার আব্বাজানের অসুখ করেছে বলে আমি এসেছি। আমি এখানে দাঁড়াব, আলবত দাঁড়াব।"

না, তোমাকে বলতেই হবে সুলতানের সাহস আছে। হয়তো সুলতানের সাহস দেখে সেই যাত্রীটির তাকে ভাল লেগে গেল। তাই তিনি বললেন, "ঠিক আছে, চলো, তোমার ঘোড়ার পিঠে চেপে আমি নীল হ্রদে যাব।"

অন্য ঘোড়াওলারা সঙ্গে সঙ্গে হাঁ-হাঁ করে উঠল, "না সাব ওর ঘোড়ায় নীলহ্রদে যাবেন না। বে-আইনি হবে। আমাদের ঘোড়া নিন।"

"বে-আইনি কেন?"

"ওকে আমরা চিনি না।"

ভিনদেশী বললেন, "ঠিক আছে আমি নীলহ্রদ যাব না। আমি ওর ঘোড়ায় চড়ে শহরে ঘুরব।"

ভিনদেশীর এই কথা শুনে অন্য ঘোড়াওলারা আর কথা বলতে পারে না। তাদের চোখের সামনেই সুলতানের ঘোড়ার পিঠে চেপে ভিনদেশী যাত্রীটি শহরে ঘুরতে বেরিয়ে

পড়লেন। সেই লোকগুলো এখন কিছু করতে না-পারলেও ওদের মুখে-চোখে যে রাগ ফেটে পড়ছে সেটা বুঝতে কষ্ট হল না।

সেই তখন থেকে যতক্ষণ না শহর ঘোরা শেষ হয় ভিনদেশী যাত্রীটি ততক্ষণ সুলতানের ঘোড়ার পিঠে বেড়ালেন। হাঁটতে-হাঁটতে কত গল্প হল সুলতানের সঙ্গে। তার ঘরের কথা। তার বাবার কথা, মায়ের কথা। আরও কত কী। শেষমেশ, যখন বেড়ানো শেষ হল, ভিনদেশী যাত্রীটি সুলতানের হাতে একটা অনেকটাকার বাণ্ডিল দিয়ে বললেন "এটা তোমার আব্বাজানকে দিও!"

সুলতান যে কী খুশি, কী বলব। কোটের পকেটে টাকার বান্ডিলটা পুরো ফেলে বারবার সেলাম করতে লাগল সেই যাত্রীটিকে। তারপর প্রায় লাফাতে-লাফাতে ছোটা দিল ঘরের দিকে।

কিন্তু সুলতানের পিছু নিয়েছে দুশমন। সেই অন্যদের ঘোড়াওলারা প্রতিশোধ নেবার জন্যে ওত পেতে বসেছিল এতক্ষণ। আর তাই সুলতান ঘরের দিকে পা বাড়াতেই তারাও নিঃসাড়ে সুলতানের পিছু-পিছু এগিয়ে চলল। যে-পথ ধরে এসেছিল সুলতান, সেই পথ ধরেই আবার ফিরে চলল। এবার তাকে একটু পা চালিয়েই হাঁটতে হবে। একটু পরেই সন্ধে নেমে আসবে। সন্ধের আগেই ঘরে পৌঁছতে না-পারলে, পাহাড়ি-পথে কোথায় কী বিপদ হয়, কে বলতেপারে। কিন্তু সুলতান তাড়াতাড়ি হাঁটবে কী, বেচারি যে বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সেই কোন্ সকালে ঘর থেকে বেরিয়েছে। তারপর থেকে হাঁটছে তো হাঁটছেই। এখন যেন আর পা চলতেই চাইছে না। তবু খানিকটা হেঁটে এল সে। তারপর ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। আর বলব কী, অমনি সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া পাহাড়-ভাঙ্গা পথের ওপর ছোটা দিল।

কিন্তু খুব বেশিক্ষণ ছুটতে হল না। শহর পেরিয়ে একটা নির্জন ঘুপচিমতো জায়গায় পৌঁছুতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে সুলতান। দেখে তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সেই লোকগুলো। তাদের চোখে ঝলসে উঠছে হিংসার আগুন। সুলতানের চোখ বিস্ফারিত। তাদের মুখে ভয়ংকর হাসি। সুলতানের বুকখানা সাহসে ফুলে ওঠে।

"কী চাই তোমাদের?" ঘোড়ার পিঠে বসে স্পষ্টগলায় জিজ্ঞেস করল সুলতান।

"হা-হা-হা!" তারা বিকটস্বরে হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে জিজ্ঞেস করল, "টাকাগুলো কোথায়?"

"টাকা আমার। আমি রোজগার করেছি। দেব না।" চড়াগলায় উত্তর দিল সুলতান।

তারা তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "খুদে শয়তান, বেশি বাড়াবাড়ি করলে, ওই খাদে ছুড়ে ফেলে দেব। ভালয়-ভালয় টাকাগুলো বার করে দে!"

"যাও যাও! ভয় দেখাবে অন্যলোককে।" বুক ফুলিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে রইল সুলতান।

"এ্যাঁ ! রোখ দেখাচ্ছিস!" বলে একটা লোক চকিতে সুলতানের ঘাড়টা থাবড়ে ধরে ঘোড়ার পিঠ থেকে ওকে নামাবার জন্যে ধস্তাধস্তি লাগিয়ে দিলে। আর ওই দ্যাখো, ঘোড়াটা চিঁ-হিঁ-হিঁ করে ড়েকে উঠেছে। মেরেছে লাফ, একেবারে লোকগুলোর ঘাড়ের ওপর। তারপর সে কী চিৎকার তার। কী লাফালাফি। দেখে মনে হচ্ছে, খেপেছে ঘোড়া। আর কে দাঁড়ায় ওখানে। পালা, পালা। যেদিকে পারল মার ছুট। এইরে। ওই দ্যাখো একটা লোক ছুটতে গিয়ে পা ফসকাল। মারল ডিগবাজি বেতাল হয়ে পড়লে গিয়ে এক্কেবারে খাদের নীচে, "আ-আ-আ-আ!" কী হবে!

এবার কিন্তু সুলতানও ভয় পেয়ে গেছে। সে তো এমনি করে কোনো মানুষকে খাদে পড়ে যেতে দেখেনি। তার ওপর তার ঘোড়ার জন্যেই তো এই কাণ্ড। লোকটা যদি না বাঁচে।

সুলতানের ঘোড়া পাহাড়ি-রাস্তায় তীরবেগে ছুটতে লাগল। যেন বোবা হয়ে গেছে সুলতান। ঘন নিশ্বাস ফেলে সুলতান হাঁপাচ্ছে যেন।

ঘরের কাছাকাছি এসে পড়েছে সুলতান। যতই সে এগিয়ে আসছে, ভয়ে যেন ততই কুঁকড়ে যাচ্ছে। কী বলবে সে আব্বাজানকে। উফ! তার চোখের সামনে একটা জীবন্ত মানুষ একটা গভীর খাদে পড়ে গেল। কী ভয়ংকর।

ঘরের সামনে এসে ঘোড়া থামল। নামল সুলতান। হুমড়ি খেতে-খেতে ছুটে গেল

ঘরের ভেতর।

"সুলতান!" বিছানায় শুয়ে-শুয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠল তার আব্বাজন।

"আব্বাজন।" ভীষণ ভয়ে আঁতকে উঠে সে আব্বাজনের বুকের ওপর ছিটকে পড়ল।

সুলতানের আম্মাও ছুটে এল, "কী হল?"

সুলতান কোনো কথা বলতে পারল না। তার কোটের পকেট থেকে টাকার বাণ্ডিলটা বার করে সে আম্মার দিকে হাত বাড়াল। আম্মা টাকাটা হাতে নিতেই কেঁদে উঠল সুলতান। মনে হল, সেই কটা হিংসুটে মানুষ যেন এখনও তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসছে, "হা-হা-হা!"

আম্মা তাকে টেনে নিল নিজের কোলে। আদর করল। চোখের জল মুছে দিল। তবুও কেমন যেন তির তির করে কাঁপতে লাগল তার বুকের ভেতরটা। সে আম্মাকে জড়িয়ে ধরল জোরে, আরও জোরে। তারপর বোবা হয়ে চেয়ে রইল আম্মার মুখের দিকে।

জেনে রাখো

নীলহ্রদ	–	নীল জলাশয়
ডাগর ডাগর	–	বড় বড়
আব্বাজান	–	বাবা (উর্দু শব্দ)
আম্মা	–	মা (উর্দু শব্দ)
দুরন্ত শীত	–	খুব বেশি শীত
সাঁঝের বেলা	–	সন্ধ্যে বেলা
কারবার	–	কাজ
হম্বি তম্বি	–	আস্ফালন
ভিনদেশী	–	অন্যদেশী
বেআইনি	–	আইনের বাইরে, যা নিয়ম নয়।

দুশমন	–	শত্রু
নির্জন	–	যেখানে লোকজন নেই
বিস্ফারিত	–	বড় হয়ে যাওয়া।

পাঠবোধ

ঠিক উত্তরটি পাশে (✓) চিহ্ন দাও।

1. সুলতানের বন্ধুর নাম কী? (রহিম/কাশিম)
2. যাত্রীরা কিসে চড়ে নীলহ্রদ দেখতে যায়? (হাতি/ঘোড়া)
3. রোজ সকালে ওসমান ঘোড়াকে কী খাওয়ায়? (ছোলা/রুটি)
4. কাশিম কী চড়ায়? (ভেড়া/ছাগল)

সংক্ষেপে উত্তর দাও:

5. সুলতানের বাবা সুলতানকে কেন শহরে ঘোড়া নিয়ে যেতে বললো?
6. নীলহ্রদ কোথায় আছে?
7. সুলতানের দুশমন কী করে খাদে পড়ে গেল?

বিস্তারিতভাবে উত্তর দাও

8. সুলতানের কাছ থেকে দুষ্টু লোকেরা তার উপার্জন কেড়ে নিতে এলে সে কি ভাবে প্রতিবাদ করে?
9. সুলতানের রূপের বর্ণনা করো?
10. মায়ের হাতে টাকা তুলে দেওয়ার সময় সুলতানের মনের অবস্থা কেমন ছিল– তার বর্ণনা করো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. দাগ দেওয়া শব্দগুলিতে কোনটির কী পদ লেখো–

   যেমন – গাল দুটি পাকা আপেলের মতো। পাকা – বিশেষণ

   ক. বরফ গলছে। ___

   খ. আকাশে এখন রোদের ছড়াছড়ি।

গ. সুলতান হাসি মুখে জবাব দিল।

ঘ. ভিনদেশী যাত্রীরা কোথায় যাচ্ছিল ?

2. বানানগুলি ঠিক করে লেখো

ঝড়না	শাহস
হিংশা	জিবন্ত

3. বাক্যগুলির ক্রিয়ার কাল লেখোঃ-

ক. সুলতান পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল।

খ. কাশিম ভেড়া চড়ায়।

গ. গত বছর আমাদের আম বাগানে খুব আম হয়েছিল।

ঘ. ওসমান কাল শহরে যাবে।

ঙ. যাত্রীরা নীলহ্রদ দেখতে যাচ্ছে।

4. তোমরা কি কখনও কোন বিপদের মুখোমুখি হয়েছো? যদি হয়ে থাকো তবে সেই ঘটনার উল্লেখ করে বিপদ থেকে কীভাবে নিজেকে বা অন্যকে মুক্ত করেছো?তার বর্ণনা খুব সংক্ষেপে লেখো।

করতে পারো।

1. সুলতান গল্পটির প্রকৃতির বর্ণনা পড়ে একটি ছবি আঁকতে পারো।
2. তোমরা ক্লাসের ভাই-বোনেরা নিশ্চয় এতদিনে সাইকেল চালাতে শিখেছ। সুযোগ পেলে সাঁতার কাটা ও ঘোড়ায় চড়া শেখার চেষ্টা করো।

আমরা ঘাসের ছোটো ছোটো ফুল

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

আমরা ঘাসের ছোটো ছোটো ফুল
হাওয়াতে দোলাই মাথা,
তুলো না মোদের দোলো না পায়ে
ছিঁড়ো না নরম পাতা।

শুধু দেখো আর খুশি হও মনে
সূর্যের সাথে হাসির কিরণে
কেমন আমরা হেসে উঠি আর
দুলে দুলে নাড়ি মাথা।।

ধরার বুকের স্নেহ কণাগুলি
ঘাস হ'য়ে ফুটে ওঠে।
মোরা তারই লাল–নীল–সাদা হাসি।
রূপকথা–নীল আকাশের বাঁশি
শুনি আর দুলি শান্ত বাতাসে
যখন তারারা ফোটে।

জেনে রাখো

দোলো না	–	মাড়িও না
কণা	–	রেণু, খুব ছোট অংশ
কিরণ	–	আলোর রশ্মি
রূপকথা	–	উপকথা (রাজা রানীর গল্প)

কাব্য পরিচয়

যে ঘাস সদাই থাকে আমাদের পায়ের নিচে, সেখানেও ফুটে থাকে ছোট ছোট ফুলগুলি। তারা বাতাসে মাথা দোলায়। সূর্যের কিরণে হাসে। ঘাসগুলি পৃথিবীর স্নেহকণা রূপে ফুটে ওঠে। রূপকথার মতো নীল আকাশের বাঁশির সুরে, শান্ত বাতাসে, তারাদের মিছিলে ঘাসেরা দুলতে থাকে। আমাদের মন খুশিতে ভরে যায়। এদের যেন আমরা পায়ে না দলি, নরম পাতাগুলি যেন না ছিঁড়ি। আর সুন্দর ফুলগুলিকে যেন গাছ থেকে না তুলি।

পাঠবোধ

খালি জায়গায় ঠিক উত্তরটি লেখো

1. আমরা.....ছোট ছোট ফুল।

ক. গাছের　　খ. ঘাসের
গ. আগাছার　　ঘ. বাগানের

2. তুলোনা মোদের দোলো না পায়ে
ছিঁড়ো না.........পাতা।

ক. তাজা — খ. শুক্‌নো

গ. নরম — ঘ. কচি

3. শুধু দেখো আর খুশি হও মনে
.... সাথে হাসির কিরণে

ক. সূর্যের — খ. চাঁদের

গ. মেঘের — ঘ. তারার

4. ....বুকের স্নেহকণাগুলি
ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে।

ক. পৃথিবীর — খ. ধরিত্রীর

গ. ভুবনের — ঘ. ধরার

5. শুনি আর দুলি.............বাতাসে
যখন তারারা ফোটে।

ক. দুরন্ত — খ. প্রশান্ত

গ. শান্ত — ঘ. অশান্ত

অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও

6. কারা হাওয়াতে মাথা দোলায়?
7. ঘাসের ছোট ছোট ফুলগুলির পাতা ছিঁড়তে বারণ করা হয়েছে কেন?
8. 'আমরা ঘাসের ছোট ছোটো ফুল' কবিতায় ধরার বুকের স্নেহকণাগুলি কী হয়ে ফুটে ওঠে?

সংক্ষেপে লেখো–

9. এই কবিতাটিতে কী দেখে মনে মনে খুশি হবার কথা বলা হয়েছে?
10. আকাশে তারা উঠলে ঘাসের ছোট ছোট ফুলগুলি কী করে?

বিস্তারিতভাবে লেখো

11. ঘাসের ছোট ছোট ফুলগুলি আমাদের কাছে কী অনুরোধ জানাচ্ছে? নিজের ভাষায় লেখো।
12. ''মোরা তারই লাল-নীল সাদা হাসি''-'আমরা ঘাসের ছোট ছোট ফুল' কবিতায় একথা কেন বলা হয়েছে? বুঝিয়ে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য তৈরি করো -

নরম	বাঁশি
আকাশ	সূর্য
কিরণ	ফুল

2. শব্দগুলির বানান ঠিক করে লেখো

রুপকথা	বাতাশ
খুসি	স্নেহকনা

3. নিচে দেওয়া শব্দগুলিকে আলাদা করে লেখো -

যেমন, বিদ্যালয় - বিদ্যা + আলয়।

রূপকথা	ঘরবাড়ি
নীলাকাশ	হাটবাজার
স্নেহকণা	সূর্যকিরণ

4. কাজ করা বোঝালে ক্রিয়ার ব্যবহার হয়। যেমন আমি পড়ি, রাম খেলে, ফুল ফোটে ইত্যাদি (দাগ দেওয়া শব্দগুলি ক্রিয়াপদ) 'আমরা ঘাসের ছোটছোট ফুল' কবিতায় অনেকগুলি ক্রিয়াপদ আছে। সেগুলি বেছে নিয়ে লেখো।

করতে পারো -

নিজেদের বাড়ির বাগানে ঘাসের মধ্যে ছোট ছোট ফুল হয়ে থাকলে, সেগুলি লক্ষ্য করো। তাদের ভালবেসে যত্ন করো। জল দাও, বেড়ে উঠতে সাহায্য করো।

লেজের কাহিনী

সুকান্ত ভট্টাচার্য

একটি মাছি একজন মানুষের কাছে উড়ে এসে বলল : তুমি সব জানোয়ারের মুরুব্বি, তুমি সব কিছুই করতে পার, কাজেই আমাকে একটি লেজ করে দাও।

মানুষটি বললে : কি দরকার তোমার লেজের?

মাছিটি বললে : আমি কি জন্যে লেজ চাইছি? যে জন্য সব জানোয়ারের লেজ আছে–সুন্দর হবার জন্য।

মানুষটি তখন বলল : আমি তো কোন প্রাণীকেই জানি না যার শুধু সুন্দর হবার জন্যেই লেজ আছে। তোমার লেজ না হলেও চলবে।

এই কথা শুনে মাছিটি ভীষণ ক্ষেপে গেল আর সে লোকটিকে জব্দ করতে আরম্ভ করে দিল। প্রথমে সে বসল তার আচারের বোতলের ওপরে, তারপর নাকে সুড়সুড়ি দিল, তারপর এ–কানে ও–কানে ভন্‌ভন্‌ করতে লাগল। শেষকালে লোকটি বাধ্য হয়ে

তাকে বলল : বেশ, তুমি উড়ে উড়ে বনে, নদীতে, মাঠে যাও, যদি তুমি কোনো জন্তু, পাখি কিংবা সরীসৃপ দেখতে পাও যার কেবল সুন্দর হবার জন্যেই লেজ আছে, তার লেজটা তুমি নিতে পার। আমি তোমায় পুরো অনুমতি দিচ্ছি।

এই কথা শুনে মাছিটি আহলাদে আটখানা হয়ে জানালা দিয়ে সোজা উড়ে চলে গেল।

বাগান দিয়ে যেতে যেতে সে দেখতে পেল একটা গুটিপোকা পাতার ওপর হামাগুড়ি দিচ্ছে। সে তখন গুটিপোকার কাছে উড়ে এসে চেঁচিয়ে বলল : গুটিপোকা! তুমি তোমার লেজটা আমাকে দাও, ওটা তো কেবল তোমার সুন্দর হবার জন্যে।

গুটিপোকা : বটে? বটে? আমার মোটে লেজই হয় নি, এটা তো আমার পেট। আমি ওটাকে টেনে ছোট করি, এইভাবে আমি চলি। আমি হচ্ছি, যাকে বলে, বুকে-হাঁটা প্রাণী।

মাছি দেখল তার ভুল হয়েছে, তাই সে দূরে উড়ে গেল।

তারপর সে নদীর কাছে এল। নদীর মধ্যে ছিল একটি মাছ আর একটি চিংড়ি। মাছি মাছটিকে বলল। তোমার লেজটা আমায় দাও, ওটা তো কেবল তোমার সুন্দর হবার জন্যে আছে।

মাছ বলল : এটা কেবল সুন্দর হবার জন্যে আছে তা নয়, এটা আমার দাঁড়। তুমি দেখ, যদি আমি ডান-দিকে বেঁকতে চাই তাহলে লেজটা আমি বাঁ-দিকে বেঁকাই আর বাঁ-দিকে চাইলে ডান-দিকে বেঁকাই। আমি কিছুতেই আমার লেজটি তোমায় দিতে পারি না।

মাছি তখন চিংড়িকে বলল : তোমার লেজটা তাহলে আমায় দাও, চিংড়ি।

চিংড়ি জবাব দিল : তা আমি পারব না। দেখ না, আমার পা-গুলো চলার পক্ষে কি রকম সরু আর দুর্বল, কিন্তু আমার লেজটি চওড়া আর শক্ত। যখন আমি জলের মধ্যে এটা নাড়ি, তখন এ আমায় ঠেলে নিয়ে চলে। নাড়ি-চাড়ি, নাড়ি-চাড়ি-আর যেখানে খুশি সাঁতার কেটে বেড়াই। আমার লেজও দাঁড়ের মতো কাজ করে।

মাছি আরো দূরে উড়ে গেল।

ঝোপের মধ্যে মাছি একটা হরিণকে তার বাচ্চার সঙ্গে দেখতে পেল। হরিণটির ছোট্ট একটি লেজ ছিল– ক্ষুদে নরম, সাদা, লেজ।

পড়ে কী বুঝলে?

1. মাছি কেন লেজ চাইছে?
2. গুটিপোকা কেমন করে চলে?
3. মাছি নদীতে কাকে দেখতে পেল?

অমনি মাছি ভন্‌ভন্‌ করতে আরম্ভ করল : তোমার ছোট্ট লেজটি দাও না হরিণ। হরিণ ভয় পেয়ে গেল।

হরিণ বললে : কেন ভাই? কেন? যদি তোমায় আমি লেজটি দিই, তাহলে আমি যে আমার বাচ্চাদের হারাব।

অবাক হয়ে মাছি বললে : তোমার লেজ তাদের কি কাজে লাগবে?

হরিণ বললে : বা, কী প্রশ্নই না তুমি করলে। ধর, যখন একটা নেকড়ে আমাদের তাড়া করে– তখন আমি বনের মধ্যে ছুটে গিয়ে লুকোই আর ছানারা আমার পিছু নেয়। কেবল তারাই আমায় গাছের মধ্যে দেখতে পায়, কেননা আমি আমার ছোট্ট সাদা লেজটা রুমালের মতো নাড়ি, যেন বলি : এই দিকে, বাছারা, এই দিকে। তারা তাদের সামনে সাদা মতো একটা কিছু নড়তে দেখে আমার পিছু নেয়। আর এভাবেই আমরা নেকড়ের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচি।

নিরুপায় হয়ে মাছি উড়ে গেল।

সে উড়তে লাগল–যতক্ষণ না সে একটা বনের মধ্যে গাছের ডালে একটা কাঠঠোক্‌রাকে দেখতে পেল।

তাকে দেখে মাছি বলল : কাঠঠোক্‌রা, তোমার লেজটা আমায় দাও। এটা তো তোমার শুধু সুন্দর হবার জন্যে।

কাঠঠোক্‌রা বললে : কী মাথা–মোটা তুমি। তাহলে কি করে আমি কাঠ ঠুকরে খাবার পাব? কি করে বাসা তৈরী করব বাচ্চাদের জন্য?

মাছি বলল : কিন্তু তুমি তো তা তোমার ঠোঁট দিয়েই করতে পার।

কাঠঠোক্‌রা জবাব দিল : ঠোঁট কেবল ঠোঁটই। কিন্তু লেজ ছাড়া আমি কিছুই করতে পারি না। তুমি দেখ, কিভাবে আমি ঠোক্‌রাই।

কাঠঠোক্‌রা তার শক্ত লেজ দিয়ে গাছের ছাল আঁকড়ে ধরে গা দুলিয়ে এমন ঠোক্কর দিতে লাগল যে তার থেকে ছালের চোকলা উড়তে লাগল। মাছি এটা না মেনে পারল না যে, কাঠঠোক্‌রা যখন ঠোক্‌রায় তখন সে লেজের ওপর বসে। এটা ছাড়া সে কিছুই করতে পারে না। এটা তার ঠেক্‌নার কাজ করে।

মাছি আর কোথাও উড়ে গেল না। মাছি দেখতে পেল সব প্রাণীর লেজই কাজের জন্যে। বে-দরকারী লেজ কোথাও নেই-বনেও না, নদীতেও না। সে মনে মনে ভাবল-বাড়ি ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। "আমি লোকটাকে সোজা করবই। যতক্ষণ না সে আমায় লেজ করে দেয় আমি তাকে কষ্ট দেব।"

মানুষটি জানলায় বসে বাগান দেখছিল। মাছি তার নাকে এসে বসল। লোকটি নাক ঝাড়া দিল, কিন্তু ততক্ষণে সে তার কপালে গিয়ে বসে পড়েছে। লোকটি কপাল নাড়ল-মাছি তখন আবার তার নাকে।

লোকটি কাতর প্রার্থনা জানাল : আমায় ছেড়ে দাও, মাছি।

ভন্‌ভন্‌ করে মাছি বলল : কিছুতেই তোমায় ছাড়ব না। কেন তুমি আমায় অকেজো লেজ আছে কিনা দেখতে পাঠিয়ে বোকা বানিয়েছো। আমি সব প্রাণীকেই জিগ্‌গেস করেছি-তাদের সবার লেজই দরকারী।

লোকটি দেখল মাছি ছাড়বার পাত্র নয়-এমনই বদ এটা। একটু ভেবে সে বলল; মাছি, মাছি! দেখ, মাঠে গরু রয়েছে। তাকে জিগ্‌গেস করো তার লেজের কী দরকার।

মাছি জানলা দিয়ে উড়ে গিয়ে গরুর পিঠে বসে ভন্‌ভন্‌ করে জিগ্‌গেস করল : গরু, গরু! তোমার লেজ কিসের জন্যে?- তোমার লেজ কিসের জন্যে?

গরু একটি কথাও বলল না-একটি কথাও না। তারপর হঠাৎ সে তার লেজ দিয়ে নিজের পিঠে সপাৎ করে মারল-আর মাছি ছিটকে পড়ে গেল।

মাটিতে পড়ে মাছির শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল-পা দুটো উঁচু হয়ে রইল আকাশের দিকে।

লোকটি জানলা থেকে বলল : এ-ই ঠিক করেছে মাছির। মানুষকে কষ্ট দিও না, প্রাণীদেরো কষ্ট দিও না। তুমি আমাদের কেবল জ্বালিয়ে মেরেছ।

পড়ে কী বুঝলে?

1. মাছি ঝোপের মধ্যে কাদের দেখতে পেল?
2. মাছি বনের মধ্যে গাছের ডালে কাকে দেখতে পেল?
3. মানুষটি জানলায় বসে কী দেখছিল?

[সোভিয়েট শিশু সাহিত্যিক ভি. বিয়াঙ্কির 'টেইল্‌স্' গল্পের অনুবাদ।]

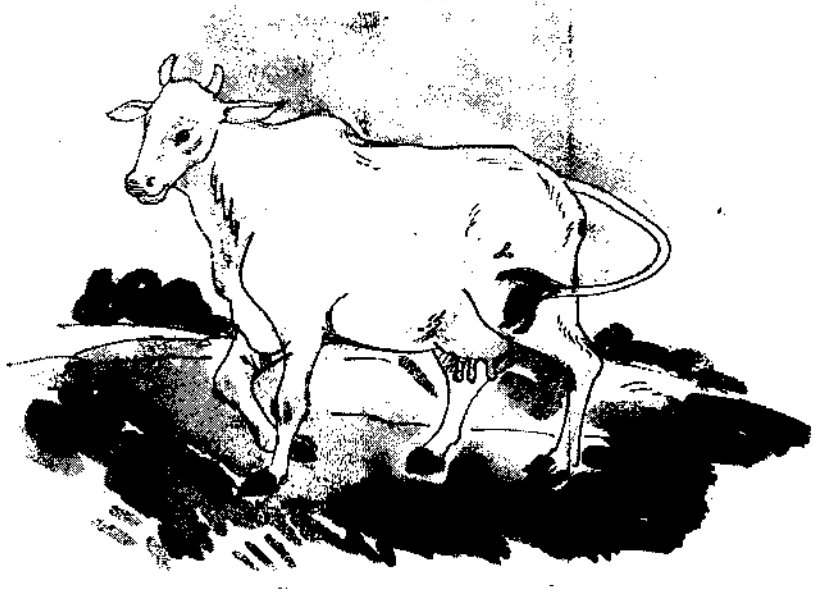

জেনে রাখো

মুরুব্বি	–	প্রধান
নিরুপায়	–	অসহায়
সরীসৃপ	–	যে সব প্রাণী বুকে ভর দিয়ে চলে
চোকলা	–	ছিলকা
গুটিপোকা	–	রেশমকীট, তুঁতপোকা
শেষ নিঃশ্বাস	–	মৃত্যু

পাঠবোধ

1. ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে খালি জায়গায় ভরো

ক. একটি মাছি একজন.....কাছে উড়ে এসে বলল। (মহিলার/মানুষের)

খ. মাছিটি ক্ষেপে গিয়ে লোকটিকে.....করতে আরম্ভ করে দিল। (আদর/জব্দ)

গ. বাগান দিয়ে যেতে যেতে মাছি দেখতে পেল একটা..... পাতার ওপর হামাগুড়ি দিচ্ছে। (গুটিপোকা/প্রজাপতি)

ঘ. মাছ বলল : আমি কিছুতেই আমার.....তোমায় দিতে পারি না। (আঁশটি/লেজটি)

ঙ. মাছি জানলা দিয়ে উড়ে গিয়ে.....পিঠে বসে ভন্‌ভন করে জিগ্‌গেস করল। (মোষের/গরুর)

সংক্ষেপে লেখো:–

2. হরিণের ছোট্ট লেজটি কেমন ছিল?
3. হরিণ কেন ভয় পেয়ে গেল?
4. মাছি একজন মানুষের কাছে উড়ে এসে কী বলল?
5. মাছি ক্ষেপে গিয়ে লোকটিকে কী ভাবে জব্দ করতে আরম্ভ করলো?
6. গুটিপোকা মাছিকে কী উত্তর দেয়?
7. বে–দরকারী লেজ কোথাও না পেয়ে, মাছি মনে মনে কী ভাবলো?
8. মানুষটিকে জানলার কাছে বসা দেখতে পেয়ে মাছিটি কী করতে লাগলো?
9. গরুর লেজের কী দরকার জিজ্ঞাসা করাতে গরু কী করে?
10. মাছি মারা যাওয়ার পর লোকটি কী বললো?

বিস্তারিতভাবে লেখো

11. মাছি বার বার লোকটিকে বিরক্ত করায় লোকটি বাধ্য হয়ে মাছিটিকে কী বললো?
12. মাছি মাছের আর চিংড়ির লেজ চাওয়াতে তারা কী উত্তর দেয় বুঝিয়ে লেখো।

13. মাছি হরিণের লেজ চাওয়াতে হরিণ কী বললো ? বিস্তারিতভাবে লেখো।

14. কাঠঠোক্রার লেজ তার কোন উপকারে আসে? 'লেজের কথা' গল্পটি অবলম্বনে বিস্তারিত ভাবে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য তৈরি করোঃ

লেজ	চিংড়ি
সুন্দর	দুর্বল
সুড়সুড়ি	সাঁতার
সরীসৃপ	নিরুপায়
আহ্লাদে আটখানা	অকেজো

2. নিচের প্রতিটি শব্দের আগে 'অ' যোগ করে বিপরীত অর্থের শব্দ লেখো।

(যেমন : সম্মান–অসম্মান)

....বিলম্বে	....ক্ষমতা
....সহ্য	....স্বাভাবিক
....স্থির	....ব্যাহত
....দৃশ্য	....বিচার
....মর	....চল
....বিরাম	....শুভ

3. কোন কাজ আগে করা হয়েছিল, এখন করা হচ্ছে অথবা পরে করা হবে – এরকম বোঝালে কালের ব্যবহার হয়। কাল অর্থ সময়। বাংলায় কাল তিন রকম:

ক. অতীতকাল (যা আগে করা হয়েছিল)

খ. বর্তমানকাল (যা এখন করা হচ্ছে)

গ. ভবিষ্যৎকাল (যা পরে হবে)

যেমন–রমেশবাবু আমাদের ইতিহাস পড়াতেন–অতীতকাল।

রমেশবাবু আমাদের ইতিহাস পড়াচ্ছেন–বর্তমানকাল।

রমেশবাবু আমাদের ইতিহাস পড়াবেন–ভবিষ্যৎকাল

নিচের বাক্যগুলির কোনটিতে কোন কাল ব্যবহার করা হয়েছে, লেখো

ক. মানুষটি জানলায় বসে বাগান দেখছিল।

খ. আমি লোকটাকে সোজা করবই।

গ. মাছিটি আহ্লাদে আঠখানা হয়ে জানালা দিয়ে সোজা উড়ে চলে গিয়েছিল।

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ

পরিবেশ কীভাবে দূষিত হয়, তা তোমরা পড়েছো। তা কী করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

আমাদের প্রত্যেককেই পরিবেশ শুদ্ধ রাখার চেষ্টা করতে হবে। বাড়ির আশেপাশে জঞ্জাল, ময়লা জল ইত্যাদি যাতে না জমে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ এই ময়লা জলে মশা-মাছিরা ডিম পাড়ে আর নানারকম জীবাণু জন্মায়। সম্ভব হলে, এইসব জায়গায় ব্লীচিং পাউডার, ফিনাইল, কেরোসিন প্রভৃতি ছড়াতে হবে।

বাড়ির দরজা-জানালা খুলে রাখতে হবে-যাতে আলো-বাতাস সহজে চলাচল করতে পারে। ঘরে নিয়মিত আলো-হাওয়া যাতায়াত করলে আমাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। বাড়ির কাছে গাছপালা লাগাতে হবে। কারণ, এই গাছেরাই আমাদের জীবন রক্ষা করে। গাছ দিনের বেলা খাদ্য তৈরি করার সময় বাতাস থেকে ক্ষতিকর কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে বাতাসে অক্সিজেন গ্যাস ছেড়ে দেয়। এইভাবে গাছ বাতাস শুদ্ধ রাখে. আমরা অক্সিজেন ছাড়া এক মুহূর্তও বাঁচতে পারি না। এছাড়া, গাছ অন্যান্য দূষিত গ্যাসও শোষণ করে এবং বাতাসে ভাসমান সূক্ষ্ম ধূলিকণা পাতার দু-পিঠে প্রচুর পরিমাণে জমিয়ে রেখে বাতাসকে পরিশুদ্ধ করে। গাছ

মূলের সাহায্যে যে জল শোষণ করে, তার সবটা কাজে লাগে না। ঐ অতিরিক্ত জল কাণ্ড আর পাতার সাহায্যে বাইরে বার করে দেয়। তার ফলে বাতাস ঠাণ্ডা থাকে।

জল ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। আবার এই জলই সবচেয়ে বেশি সংক্রামক রোগ ছড়ায়। কাজেই জল; বিশেষ করে পানীয় জল, শুদ্ধ রাখা দরকার। পাতকুয়া আর টিউবওয়েলের ধারে কাছে মলমূত্র ত্যাগ করা উচিত নয়। পাতকুয়ার পাড় উঁচু করে বাঁধিয়ে দেওয়া উচিত। টিউবওয়েলের আশেপাশে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো হলে ভালো হয়। কোনো-কোনো জায়গায়

পড়ে কী বুঝলে?

1. পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করার জন্য কী ছড়াতে হবে?
2. বাড়ির দরজা - জানালা খুলে রাখতে হবে কেন?
3. গাছ দিনের বেলা খাদ্য তৈরি করার সময় বাতাস থেকে কী শোষণ করে?

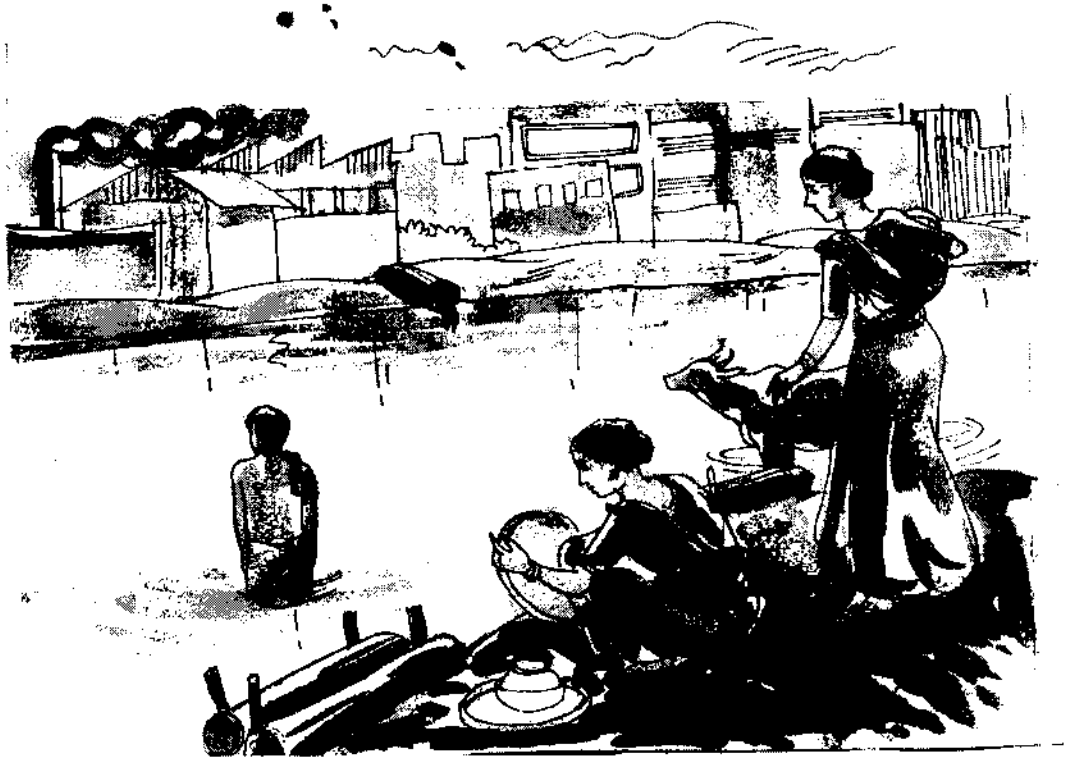

পুকুরের আর নদীর জল পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এইসব জল যাতে দূষিত না হয় তার চেষ্টা করতে হবে। পুকুরে ময়লা কাপড় কাচা বা সাবান ব্যবহার করা উচিত নয়। জীবজন্তুকে জলে নামিয়ে স্নান করানোও ঠিক নয়। পুকুরের আশপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে। পুকুরে কচুরিপানা আর অন্যান্য আগাছা জন্মাতে দেওয়া চলবে না। পুকুরের জল সারাদিন রোদ পেলে ভালো হয়। তাতে জল ভালো থাকে। সহজে দূষিত হয় না। বর্ষার সময় বৃষ্টির জলে ধুয়ে অনেক আবর্জনা পুকুরে বা নদীতে পড়ে। কাজেই ঐ সময় জল ফুটিয়ে পান করা উচিত। চাষের জমিতে কীটনাশক দ্রব্যগুলি বা রাসায়নিক সার খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। জমিতে দেবার আগে এইসমস্ত জিনিস ব্যবহার করার সঠিক পদ্ধতি জেনে নিতে হবে। এই সব কীটনাশক বা সার যাতে বৃষ্টির জলে বা সেচের জলে ধুয়ে নিকটের নদীনালার জলে না মেশে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

গৃহপালিত জন্তুরাও আমাদের পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। গোরু, ছাগল,

মোষ, হাঁস আর মুরগি আমাদের বাড়তি খাবার, আনাজের খোসা, ঘাস, ছোটো-ছোটো আগাছা খেয়ে আমাদের পরিবেশ পরিষ্কার রাখে। এ ছাড়া, চিল, শকুন প্রভৃতি ঝাড়ুদার পাখিরাও পচা জিনিস খেয়ে আমাদের আশপাশ পরিষ্কার রাখে।

ঘনবসতি অঞ্চলের লোকেদের নিয়মিত কিছু সময় খোলা জায়গায় বেড়ানো উচিত। এতে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। যদি বাড়িতে বাগান না থাকে তাহলে বাড়ির ছাদে বা বারান্দায় টবে গাছ লাগানো যায়। বাড়ির মধ্যে কীটনাশক ওষুধ খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। কারণ,এইসব জিনিস শুধু পোকামাকড়ই ধ্বংস করে না, মানুষেরও ক্ষতি করে। এ ছাড়া, শব্দদূষণ রোধ করার জন্য পটকা, দোদমা প্রভৃতি বাজির ব্যবহার কমানো এবং একটানা উচ্চগ্রামে মাইক বাজনো বন্ধ করা উচিত।

পড়ে কী বুঝলে?

1. গাছ বাতাসে কোন গ্যাস ছাড়ে?
2. ঝাড়ুদার পাখিগুলির নাম বলো।
3. শব্দদূষণ রোধ করার জন্য কী করা উচিত?

জেনে রাখো

নিয়ন্ত্রণ	–	কাবু রাখা
উচ্চ গ্রামে	–	উঁচু আওয়াজে
অতিরিক্ত	–	বাড়তি
মুহূর্ত	–	অল্পসময়
সংক্রামক	–	ছোঁয়াচে
আবর্জনা	–	ময়লা জঞ্জাল
পদ্ধতি	–	উপায়

পাঠবোধ

সংক্ষেপে উত্তর দাও:

1. কী কী কারণে বায়ু দূষিত হয়?
2. ঝাড়ুদার পাখি বলতে কাদের বোঝায়?
3. পরিবেশ পরিষ্কার রাখে এমন পাঁচটি পশু-পাখির নাম লেখো।
4. বর্ষার সময় জল ফুটিয়ে পান করা উচিত। কেন?

বিস্তারিতভাবে উত্তর দাও

5. আমাদের পরিবেশে বায়ু ছাড়া আর কী কী দূষিত হচ্ছে এবং কীভাবে লেখো।
6. পটকা, দোদমা প্রভৃতি বাজির ব্যবহার কমানো এবং উঁচু আওয়াজের মাইক বাজানো বন্ধ করলে আমাদের কী লাভ হবে?
7. পরিবেশকে সুস্থ রাখার জন্য বর্তমান সরকার কী কী ব্যবস্থা করেছেন?
8. বাড়িতে বাগান না থাকলে বাগানের অভাব কিভাবে পূরণ করা যায়?
9. যে পুকুরের জল পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করা হয় সেই জল যাতে দূষিত না হয় তার জন্য কী কী করা উচিত?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচে 'মান' আর 'পানা' শব্দ যুক্ত কয়েকটি বাক্যাংশ দেওয়া রয়েছে, এবার এগুলিকে পুরো বাক্যে পরিণত করো

   ক. ভাসমান :..

   খ. মানকচু : ....

   গ. মানসম্মান :..

   ঘ. পরিমাণ :..

   ঙ. কচুরি পানা : ....

   চ. বেলের পানা : ....

   ছ. চাঁদপানা মুখ : ....

2. শূন্য স্থানে ঠিক অক্ষরটি বসিয়ে শব্দ লেখো–

   (ক্ত, শ, স্ট, জ, ক, স্ত্রি, ং, স্ক, ই)

পরিবে......।	অতিরি....।
ব্লীচি....।	ধূলি.....ণা।
অ.....জেন।	সিমে....।
অক্সা....ড।	জীব......স্তু।
পরি..... র।	

3. নিচের শব্দগুলিকে আলাদা করে লেখো –

টিউবওয়েল	জীবজন্তু
আলোবাতাস	আশেপাশে
কীটনাশক	কচুরিপানা
গৃহপালিত	নদীনালা
পোকামাকড়	ঘনবসতি

4. ঠিক বানানে (✓) চিহ্ন দাও –

সূক্ষ্ম/সুক্ষ্ম	কিটনাশক/কীটনাশক
পরিবেস/পরিবেশ	ধ্বংশ/ধ্বংস

5. তোমরা আগের পাঠে নাম বোঝালে যে বিশেষ্য হয়, তা জেনেছ। বিশেষ্য অর্থাৎ নাম পদটির দোষ, গুণ, সংখ্যা ইত্যাদি যে পদের দ্বারা জানা যায়,তাকে বিশেষণ বলে, তা জেনে রাখো। নিচে কয়েকটি শব্দ দেওয়া হলো, সেগুলির কোন্‌টি বিশেষ্য আর কোনটি বিশেষণ তা লেখো–

গাছ	মানুষ
গোরু	পাখি
দূষিত	পরিষ্কৃত
জলীয়	রাসায়নিক
ঝাড়ুদার	ব্যবহৃত

6. নিজের বাসস্থানের ও স্কুলের আশপাশের জায়গা কিভাবে পরিষ্কার রাখবে, সে বিষয়ে তোমার বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো।

বটগাছ

মনীন্দ্র রায়

খেয়াঘাটে আছে এক
বুড়ো বটগাছ,
ডালে তার সারাদিন
পাখিদের নাচ।
মাঝগাঙে যদি ভাই
খেয়া চলে যায়।
লোকেরা ছায়ায় বসে
শরীর জুড়ায়।
সাঁঝবেলা পথিকেরা
ভাবে, হাঁটা মিছে
খড়-কুটো জ্বেলে ভাত
রাঁধে তার নিচে।

খেয়ে দেয়ে শোয় তারা,
নদী রয় পাশে।
পাতাগুলি তাই দেখে
জোছনায় হাসে।

জেনে রাখো

খেয়া	–	নদী পারাপারের নৌকা
খেয়াঘাট	–	নদীর যে জায়গা থেকে নৌকা চড়ে নদী পার হয়।
গাঙ	–	বড় নদী [সংস্কৃত গঙ্গা থেকে শব্দটি এসেছে]
বুড়ো বটগাছ	–	ডালপালা ছড়ানো বিশাল প্রাচীন বটগাছ।
মাঝ গাঙ	–	মাঝ নদীতে
জুড়ায়	–	ঠান্ডা হয়
সাঁঝ বেলা	–	সন্ধ্যা বেলা [সন্ধ্যা শব্দ থেকে কবিতায় সাঁঝ হয়েছে]
পথিক	–	পথে চলে যে [পায়ে হেঁটে]
রয়	–	থাকে
জোছনা	–	চাঁদের আলো [মূল শব্দ জ্যোৎস্না, কবিতায় জোছনা হয়েছে]

কাব্য পরিচয়

নদীর ধারে একটি বহু প্রাচীন বটগাছের ডালে সারাদিন পাখিদের আনন্দ কোলাহল স্থানটিকে মাতিয়ে রাখে। ভর দুপুরে নদীর ওপারে যাওয়ার জন্য পথিক এসে যদি দেখে নৌকা ঘাট ছেড়ে মাঝ নদীতে চলে গেছে তখন তারা এই বটের ছায়ায় বসে আরাম করে। সন্ধ্যে হলে ফিরে না গিয়ে এই বটতলাতেই নিজেদের আহারটুকু সেরে নিয়ে শোয়ার ব্যবস্থা করে। কারণ, পরদিন ঠিক সময়ে খেয়া নৌকা ধরে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছাবে। পশু-পাখি ও পথিকের আশ্রয়দাতা এই বৃদ্ধ বটের পাতাগুলি হাল্কা হাওয়ায় জ্যোৎস্নার আলোকে যখন ঝল্‌মল্ করে ওঠে তখন কবির মনে হয় গাছের ভাললাগা, ভালবাসার হাসি যেন পাতার মধ্যে দিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

পাঠবোধ

নিচের খালি জায়গাগুলি ঠিক শব্দ দিয়ে ভরো

1. খেয়াঘাটে আছে এক বুড়ো.....[আমগাছ/বটগাছ]
2. ডালে তার.....পাখিদের.....[সারাদিন/সারারাত, নাচ/ঘুম]
3. .....ছায়ায় বসে শরীর জুড়োয় [লোকেরা/পাখিরা]
4. .....পথিকেরা ভাবে হাঁটা মিছে [ভোরবেলা/সাঁঝবেলা]
5. .....জ্বেলে ভাত রাঁধে তার নিচে [ঘাস-পাতা/খড়-কুটো]

সংক্ষেপে উত্তর দাও

6. খেয়াঘাট কাকে বলে?
7. কবি বটগাছটিকে বুড়ো কেন বলেছেন?
8. গাঙ শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?
9. খেয়া চলে গেলে লোকেরা কী করে?
10. সাঁঝ শব্দটির মূল রূপ লেখো।
11. জোছনা শব্দটির মূল শব্দ কী?

বিস্তারিতভাবে উত্তর দাও

12. বুড়ো বটগাছটি কার কার আশ্রয় স্থল? সে কাকে কীভাবে সেবা করে? 'বটগাছ' কবিতাটি পড়ে বুঝিয়ে লেখো।
13. বটগাছের পাতাগুলি কি সত্যি হাস্‌ছে? কবি কেন লিখেছেন পাতা হাস্‌ছে? তুমি বুঝিয়ে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. একই উচ্চারণের দুটি শব্দ। ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়। তুমি শব্দগুলি দিয়ে বাক্য রচনা করো।

   উদাহরণ :

   ডাল - গাছের ডালে পাখি বসে।

   ডাল - ডালের বড়া খেতে ভালো।

করো :

সারা – তারা –

সারা – তারা –

জ্বেলে – পাতা –

জেলে – পাতা –

জেলে –

2. বিপরীত শব্দ লেখো –

বুড়ো নিচে

দিন শোয়

সাঁঝ হাসে

3. নিচের শব্দগুলিতে এক থেকে বহু করো

লোক পথিক

সে পাতা

করতে পারো

তোমরা নিশ্চয়ই বটগাছ দেখেছ। বটগাছের ছবি আঁকবার চেষ্টা করো। বটগাছে কোন কোন পাখি বসে, সেই পাখিগুলিকে চিনে নিয়ে। তাদের নাম লেখো।

গুপী গাইন বাঘা বাইন

সত্যজিৎ রায়

গুপী–বাঘাকে একটা গম ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। চারিপাশে চোখ–জোড়ানো প্রাকৃতিক দৃশ্য পাখির ডাক ছাড়াও দূর থেকে এক সুরেলা বাঁশির সুর ভেসে আসছে।

গুপী : কী সুন্দর দেশ দেখেছো, অ্যাঁ?

বাঘা : কি রকম ফসল হয়েছে!

গুপী : হ্যাঁ! আবার কোথায় যেন বাঁশি বাজাতেছে।

বাঘা একজন চাষীকে দেখতে পেয়ে ডাকে।

বাঘা : এই যে!

চাষী বাঘাকে দেখে।

বাঘা : এই দেশের নাম কি শুণ্ডি?

চাষী ঘাড় নাড়ে।

গুপী–বাঘা: এখানকার রাজবাড়িটা কোথায় বলতে পার ?

চাষী হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সে কথা না বলায় গুপী–বাঘা একটু অবাক হয়।

গুপী : বোবা না কি?

বাঘা : হাবা হাবা, চলো।

দুজনে এগিয়ে যায়।

শুণ্ডির বাজার। নানা পসরার দোকান ছাড়াও আছে নাগোর দোলা ইত্যাদি। লোকে লোকারণ্য, কিন্তু একজনেরও মুখে কথা নেই। গুপী–বাঘা অবাক হয়ে ভীড় ঠেলে ঘুরে ঘুরে সব দেখে তারপর একজন বয়স্ক লোককে জিজ্ঞেস করে–

বাঘা : এখানকার রাজবাড়িটা কোথায় বলতে পার?

গুপী : রাজবাড়ি, রাজবাড়ি।

সে লোকটাও বোবা। কিন্তু বাঘার কথা বুঝতে পেরে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। বাজার ছাড়িয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় ওদের দেখতে পেয়ে দুটো বাচ্চা ছেলে তালি দিতে দিতে এগিয়ে আসে। সঙ্গের লোকটি বাঘাকে ইশারায় জানায়, বাচ্চা দু'টি

ঢোলের বাজনা শুনতে চায়। বাঘা ঢোল বাজায়। বাচ্চা দু'টি আনন্দে তালি দিতে থাকে – কিন্তু কোনো কথা বলে না।

একটা টিপির উপর উঠে লোকটি গুপী-বাঘাকে শুণ্ডির রাজবাড়ি দেখায়।

গুপী : বাঃ!

বাঘা : কী সুন্দর!

গুপী : আচ্ছা, ওইখানেই বুঝি গানের বাজি হবে?

বয়স্ক লোকটি হেসে মাথা নাড়ে, তারপর তার থলে থেকে দু'টো আপল বের করে গুপী-বাঘার দিকে এগিয়ে ধরে।

গুপী : না, না আমরা অনেক খেয়েছি। আমাদের প্যাটে খিদা নাই।

বাঘা: আমাদের ট্যাঁকে পয়সা নাই। গরিব তো!

লোকটি ইশারায় জানায় যে সে পয়সা চায় না।

বাঘা : এমনি দিচ্ছে?

লোকটি মাথা নাড়ে। বাঘা একগাল হেসে আপেল দুটি নিয়ে নেয়।

গুপী : তুমি বড় ভালো লোক।

বাঘা : বড় দয়ালু। তোমরা কথা বলনা বুঝি?

গুপী : বোবা?

লোকটি গম্ভীর হয়ে যায়, তার চোখ ছল ছল করে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে বিদায় নেয়।

বাঘা : চলো যাওয়া যাক্।

গুপী : কিন্তু যদি ঢুকতে না দেয়?

বাঘা : এসো না । অত ভয় কিসের?

দুজনে রাজবাড়ির দিকে রওনা দেয়। শুণ্ডি রাজার বিশাল দরবার। রাজামশাই এখনো অনুপস্থিত, তাই গানের বাজিও শুরু হয়নি। ওস্তাদেরা যে যার জায়গায় বসে গলা সাধছে। একটা খালি জায়গা দেখে গুপী-বাঘা সেখানে গিয়ে বসে। বাজিয়েরা নিজেদের বাজনা ঠিক করে নেয়। দেখাদেখি বাঘাও তার সামনে রাখা ঢোলে একবার চাঁটি মেরে দেখে নেয়।

* * *

হাল্লা রাজ্য। মন্ত্রীর ঘর। গুপ্তচর বিদায় নেয়, এবং তার জায়গায় জাদুকর বরফি তার হাতের যাদু দণ্ডটি নাড়াতে নাড়াতে আর নাচতে নাচাতে এসে মন্ত্রীর সামনে দাঁড়ায়।

মন্ত্রী : এবার তোমার ওই তিড়িং বিড়িং বন্ধ কর। ওখানে বসো। কথা আছে।

বরফি তার হাতের যাদু দণ্ডটি ঘুরিয়ে শূন্য থেকে একটা বসার চৌকি হাজির করে। সেটায় বসতে গিয়ে আসনশুদ্ধু ভেঙে পড়ে।

মন্ত্রী : বাঃ!

বরফি বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার দণ্ডটি সেই ভাঙা চৌকিটাকে এক ঘা মেরে সেটাকে

অদৃশ্য করে, তারপর এক বিশাল সাদা ব্লক উপস্থিত করে সেটায় বসে।

মন্ত্রী : তোমার যাদুর যা বহর দেখছি, তা তোমার মেয়াদ কদ্দিন?

বরফি তিন আঙুল দেখায়।

মন্ত্রী : তিন দিন?

বরফি মাথা নাড়ে। মন্ত্রী চিন্তিত।

মন্ত্রী : ও বাবা। তাহলে তো আর সময় নেই। যা কিছু এরই মধ্যে শেষ করতে হবে। শোনো বরফি, শুণ্ডিরাজ্য দখল করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। একেবারে হাতের কাছে পাকা ফল– শুধু পেড়ে নিলেই হল।

বরফির মুখে হাসি – সে একদৃষ্টে মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে।

মন্ত্রী : কিন্তু প্রজারা যদি তোমার মতো বোবা হয়, সে রাজ্য চালানো যায় কি? তারা যা চায়, সেটা যদি না বলে সেটা পাবার পথ বন্ধ করা যায় কি? তাহলে এবার তুমি তোমার বদ্যিগিরিটা দেখাও দিকিনি। বেশ কড়া করে একটা ওষুধ তৈরি করো, যাতে এক ধাক্কায় সব ব্যাটারা একসঙ্গে কথা বলে ওঠে।

বরফি মাথা নেড়ে পকেট থেকে এক বিশাল গোটানো ওষুধের ফর্দ বের করে। ফর্দের তালিকায় বোবার ওষুধ দেখতে পেয়ে সে দন্তবিকশিত করে মন্ত্রীর দিকে তাকায়।

মন্ত্রী : পারবে?

বরফি ঘাড় নাড়ে।

মন্ত্রী : কালকের মধ্যে চাই কিন্তু!

বরফি হেসে আবার মাথা নাড়ে। এবার মন্ত্রীর মুখেও হাসি দেখা দেয়।

মন্ত্রী : বেশ। চলো–রাজামশাইয়ের সঙ্গে ব্যাপারটা সেরে আসা যাক্, অ্যাঁ?

দু'জনে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। হাল্লা রাজার ঘর।

রাজা আপন মনে গুনগুন করতে করতে সাদা কাগজ কেটে পাখি তৈরি করছে। দেখেই মনে হয় অত্যন্ত সরল ও নিরীহ লোক। নেপথ্যে দরজার তালা খোলার আওয়াজ শুনে

রাজা সেদিকে তাকায়।

মন্ত্রী ও জাদুকর বরফি প্রবেশ করে। মন্ত্রীর গলায় ছেলে-ভোলানো সুর।

মন্ত্রী : পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল। হেঁঃ! তোমাকে যে এবার একটু সিংহাসনে বসতে হবে বাবা।

রাজা : কেন?

মন্ত্রী : হেঁ হেঁ। শুধু শুধু বসে বসে খেলা করলে লোকেরা যে ছ্যা ছ্যা করবে, সেটা কি ভালো হবে? আজ বাদে কাল যুদ্ধ হবে।

রাজা : (বিস্মিত) যুদ্ধ?

মন্ত্রী : হুঁ। খুব বড় যুদ্ধ। নইলে রাজ্য বাড়বে কি করে বলত? অস্ত্র-শস্ত্র যে সব মর্চে ধরে যাবে।

রাজা : কে যুদ্ধ করবে?

মন্ত্রী : এই দ্যাখো। আবার খোকা-খোকা কথা বলে। দু'দিন ভালো করে যুদ্ধ করে নাও, তারপর তোমার ছুটি।

শিশু সুলভ রাজার দৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

রাজা : ছুটি!

মন্ত্রী : হ্যাঁ! তোমার ছুটি! এবার হাঁ কর, হাঁ কর – হাঁ করে খেয়ে ফেল!

রাজা বাধ্য ছেলের মতো হাঁ করে। মন্ত্রী তাকে বরফির দেওয়া ওষুধ খাইয়ে দেয়-

মন্ত্রী : এবার শুয়ে পড় তো –

রাজার চোখ বন্ধ হয়ে আসে – তাকে শুইয়ে দেওয়া হয়। তারপর দেখতে দেখতে তার চেহারায় এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে- ঝুলন্ত গোঁফ-দাঁড়ি পাকিয়ে পেঁচিয়ে ওঠে। চোখ খুলতেই তার দৃষ্টিতে আসে ক্রুরতা। সে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ফোঁস করে উঠে বসে- তার পর হাতের সাদা কাগজের তৈরি পাখিটা এক টানে ছিঁড়ে-

রাজা : যুদ্ধ।

মন্ত্রীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে রাজা একলাফে উঠে পড়ে।

* * *

শুন্ডি রাজার দরবার। রাজা মশাই প্রবেশ করতেই সকলে উঠে দাঁড়ায়। রাজা সকলকে বসতে বলে নিজে সিংহাসনে বসেন, তারপর ঘন্টা বাজান।

শুরু হয়ে যায় গানের বাজি। ওস্তাদেরা বিভিন্ন ধরনের গান গেয়ে পর পর শোনাতে থাকেন–খেয়াল, কীর্তন, ধ্রুপদ, ঠুংরি ইত্যাদি। অবশেষে শুরু হয় এক অত্যন্ত টিমো লয়ে খেয়াল। গুপী–বাঘার দৃষ্টি চলে যায় রাজার দিকে–তিনি ঘুমে ঢলে পড়েছেন, মৃদু মৃদু নাকও ডাকছেন রাজার এই হাল দেখে ওস্তাদ, যিনি গাইছিলেন, তাঁর গান থামান। তাতেও রাজার ঘুম না ভাঙায় বাঘা ঢোলে সজোরে এক চাঁটি মারে। রাজা হকচকিয়ে উঠে পড়েন, তারপর লজ্জায় জিভ কেটে ঘন্টা বাজিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে গুপী–বাঘা উঠে পড়ে গান ধরে–

গুপী : মহারাজ–তোমারে সেলাম।
সেলাম । সেলাম।

বাঘা : সেলাম।

গুপী : মোরা বাংলাদেশের থেকে
এলাম।
মোরা সাদা সিধা
মাটির মানুষ
দেশে দেশে যাই।
মোদের নিজের ভাষা ভিন্ন
আর ভাষা জানা নাই–
মহারাজ।

বাঘা : রাজামশাই।

রাজা এবং অন্যান্য ওস্তাদেরা অবাক হয়ে গুপী–বাঘার গান শোনেন–

গুপী : তবে জানা আছে ভাষা অন্য

তোমারে শুনায়ে ধন্য
এসেছি তাহারি জন্য
রাজা –
মহারাজ!
মোরা সেই ভাষাতেই করি গান–
রাজা শোনো ভরে
মন প্রাণ–

গুপীর গানে রাজা দুলে ওঠেন। গানের তালে তিনি এপাশ–ওপাশ দুলতে থাকেন–মুখে তৃপ্তির হাসি। অন্যান্য ওস্তাদেরও সেই একই অবস্থা।

গুপী : এ যে সুরেরই ভাষা,
ছন্দেরই ভাষা,
তালেরই ভাষা
আনন্দেরই ভাষা!
ভাষা এমন কথা বলে
বোঝেরে সকলে
উঁচা–নীচা,
ছোট–বড় সমান, রাজা–
উঁচা–নীচা, ছোট–বড় সমান–
মোরা এই ভাষাতেই
করি গান!
করি গান–
মহারাজা –
তোমারে সেলাম।

জেনে রাখো

বাঁশি বাজতেছে	–	বাঁশি বাজছে (গ্রাম্য কথ্য ভাষা)
প্যাটে খিদা	–	পেটে খিদে (গ্রাম্য কথ্য ভাষা)
বিশাল সাদা ব্লক	–	বসার জন্য উঁচু চৌকা আসন
বদ্যিগিরি	–	ডাক্তারি করা, কবিরাজী করা

তোমাদের পাঠে ওপরের চিত্রনাট্যটি বড় নাটকের ছোট একটি অংশ।

পাঠ পরিচয়

দুটি রাজ্য। শুন্ডি ও হাল্লা। তার দুই রাজা।

ভূতের রাজার আশীর্বাদ প্রাপ্ত দুটি ছেলে গুপী গাইন ও বাঘা বাইন। গুপী গাইন–যার গান শুনে কেবল মানুষই নয় বনের পশু পাখিও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ে। বাঘা বাইন – যার ঢোলের আওয়াজ শুনে রাজা–প্রজা, পশু–পাখি, সবাই যে যার জায়গায় স্তব্ধ হয়ে যায়।

গুপী ও বাঘা শুন্ডি রাজ্যে প্রবেশ করে। রাজা, রানী ও তাদের পরিবারের অনুপস্থিতিতে শুন্ডি রাজ্যে এক অদ্ভুত রোগ ছড়িয়ে পড়ে তাতে রাজ্যবাসীরা কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু তারা সবাই খুব অতিথিপরায়ণ। গুপী বাঘা শুন্ডি রাজ্যে আসে গানের বাজির আসরে গান গাইতে।

পাশে অপর একটি রাজ্য–হাল্লা রাজ্য। এই রাজ্যে রাজা আছেন, আছেন মন্ত্রী ও জাদুকর বরফি। তারা দুষ্টু লোক। রাজাকে যাদুকর ওষুধ খাইয়ে তাঁর মনটাকে সরল, নিরীহ শিশু করে ঘরে তালা বন্ধ করে রেখেছে। মন্ত্রি ও যাদুকর শুন্ডি রাজ্য আক্রমণ করার শলা–পরামর্শ করে। শুন্ডি রাজ্যের বোবা প্রজাদের নিয়ে রাজ্য চালানো যায় না তাই কথা বলানোর জন্য মন্ত্রি যাদুকর বরফিকে বিশেষ ওষুধও তৈরি করার কথা বলে। রাজাকে উত্তেজক ওষুধ খাওয়ায়। যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করে। ভাই শুন্ডি রাজ্যের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতি নেয়।

গুপী ও বাঘা শুন্ডি রাজার গানের আসরে উপস্থিত হয়। গান ও বাজনায় সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দেয়। রাজা খুশি হয়ে তাঁর রাজ্যে তাদের সসম্মানে আশ্রয় দেন।

আসরে তাদের গানটি ভালো করে পড়ো। গুপী বাঘা তাদের মাতৃভাষায় গান করে। মাতৃভাষায় কথা বলার মতো আনন্দ জগতের সব আনন্দকে ম্লান করে দেয়। বিশেষ করে বাংলাভাষা। এর অগাধ ঐশ্বর্য। এই ভাষা তোমার আমার সবার গর্ব। গুপী জানায় মাতৃভাষা ছাড়া তারা অন্য ভাষা জানে না। তবে, আর একটি ভাষা তারা জানে তা সংগীতের ভাষা, গানের ভাষা, সুরের ভাষা। সুর যদি তার ছন্দ, তাল সহযোগে মধুর হয়ে ওঠে তবে সেখানে ভাষা গৌণ হয়ে পড়ে। সেই সুরের ভাষা হৃদয়কে স্পর্শ করে যায়। মন-প্রাণ আনন্দে ভরে ওঠে। তাই ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য থেকে ভিন্ন ভাষাভাষীর ওস্তাদরাও গুপীর গানে মেতে ওঠেন। সেখানে ভাষা কোন বাধা হয়ে ওঠে না।

পাঠবোধ

1. ''কিন্তু প্রজারা যদি তোমার মতো বোবা হয়, সে রাজ্য চালানো যায় কি? তারা যা চায়, সেটা যদি না বলে, সেটা পাবার পথ বন্ধ করা যায় কি? তাহলে এবার তোমার বদ্যিগিরিটা দেখাও দিকিনি। বেশ কড়া করে একটা ওষুধ তৈরি করো, যাতে এক ধাক্কায় সব ব্যাটারা একসঙ্গে কথা বলে ওঠে।''

   ওপরের পাঠটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

   ক. ওপরের পাঠের কথাগুলি কে বলেছে?

   খ. কোথাকার প্রজারা বোবা?

   গ. কে বদ্যিগিরি দেখাবে? নাম লেখো।

   ঘ. কাকে এবং কেন ওষুধ তৈরি করতে বলল?

উত্তর দাও

2. নাটকের প্রথমে গুপী বাঘা কোন রাজ্যে প্রবেশ করে? তারা কেন সেই রাজ্যে আসে?
3. 'তোমরা বড় ভালো লোক' কথাটি কে বলেছে? কাদের বলেছে? কেন ভালো লোক বলল? লেখো।
4. রাজা মশাইয়ের অনুপস্থিতিতে শুন্ডি রাজার বিশাল দরবারে গানের আসরের বর্ণনা পাঠ অবলম্বনে লেখো।

5. বন্ধ ঘরে হাল্লার রাজা কী করছিল?
6. হাল্লার রাজাকে ওষুধ খাওয়ানোর পর তার চেহারা ও স্বভাবের যে পরিবর্তন হোল তা পাঠ অবলম্বনে নিজের ভাষায় লেখো।
7. শুন্ডির রাজা সভায় গুপী যে গান গাইল সেই গানের প্রথম চার লাইন লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. যে শব্দগুলি বিশেষণ সেগুলি সেই বাক্যের পাশে লেখো

সুন্দর দেশ.....
পাকা ফল.....
সুরেলা বাঁশি.....
কড়া ওষুধ.....
আমরা গরীব.....
ওস্তাদেরা অবাক.....
লাল আপেল.....
দয়ালু রাজা.....

2. সন্ধি করো

লোক + অরণ্য
সিংহ্ + আসন
অতি + অন্ত
লোক + আলয়

3. বিপরীত শব্দ লেখো

দৃশ্য
গরিব
উপস্থিত
সুখ
বাচ্চা
হাসি

করতে পারো

1. তোমরা বন্ধুরা মিলে নাটকটি স্কুলে বা পাড়ায় অভিনয় করতে পারো।
2. গুপীর গাওয়া গানটির সুর ক্যাসেট বা সি.ডি.র মাধ্যমে শুনে যারা গাইতে পারো তারা শিখে নাও।

চুপি-চুপি

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বসে-বসে যে ঝিমোয়
বাংলার ক্লাসে,
কোন মজা পায়নি সে
সন্ধি-সমাসে।
ইংরেজি-পিরিয়ডে
ছাড়ে যার নাড়ি,
প্রিপোজিশানেই তার
গোলমাল ভারি।
ইতিহাস শুরু হলে
ছোটে যার ঘাম,
নিশ্চয়ই ভুলেছে সে
বাবরের নাম।
ভূগোলের ঘন্টায়
মুখখানা ভার?
জানে না সে ফুজিয়ামা
নদী না পাহাড়।

অঙ্কের পিরিয়ডে
গোনে কড়িকাঠ
খাতায় সে লেখে তিন
তিরিক্কে আট
চুপি-চুপি বলি শোনো
কথাটা না রটে,
একদা আমিও তা-ই
লিখতুম বটে।

জেনে রাখো

ফুজিয়ামা – জাপানের ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি

কড়িকাঠ গোনা – আগেকার দিনে বাড়ির ছাতকে ধরে রাখবার জন্য কাঠ ব্যবহার করা হোত। লম্বা লম্বা কাঠের পাটাতন ছাতে বসানো হোত। অলসভাবে বসে বসে ছাতের দিকে তাকিয়ে থাকাকে বলা হয় কড়িকাঠ গোনা।

কাব্য পরিচয়

এই কবিতায় কবি প্রথমেই সতর্ক করে দিয়েছেন যে সব পড়ুয়া অলস ও অমনোযোগী তারা সবসময় পিছিয়ে থাকে। ক্লাসে কোনো বিষয়েই মন লাগে না, তাই বাংলা হোক বা ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক সব বিষয়গুলি কঠিন লাগে। কবিতার শেষে কবিও চুপি-চুপি স্বীকার করেছেন ছোটবেলায় মন না লাগার জন্য অনেক ভুল করতেন।

পাঠবোধ

প্রশ্নের পাশে বিষয়গুলি লেখা আছে, তোমার যদি মনে হয় ভুল করে সাজানো আছে তবে ঠিক করে লেখো।

1. পড়ুয়া কোন ক্লাসে ঝিমোয়? — 1. ইংরেজি
2. কোন্ বিষয়ে গোলমাল হয়? — 2. বাংলা
3. ঘাম ছোটে কোন্ পড়াতে? — 3. অঙ্ক
4. মুখ ভার ক্লাসের কোন ঘন্টায়? — 4. ভূগোল
5. কোন পিরিয়ডে পড়ুয়া কড়িকাঠ গোনে? — 5. ইতিহাস

বিস্তারিতভাবে লেখো

6. ''বসে বসে যে ঝিমোয়
   বাংলার ক্লাসে
   কোন মজা পায় নি সে
   সন্ধি-সমাসে''

   উপরের লাইনগুলি কোন কবিতার অংশ ? কবি কে?

কবিতাটিতে কবি জানিয়েছেন পড়ায় একটা মজা আছে, আর সেই মজা বা আনন্দ পেলে

কোনো পড়াই বুঝতে কঠিন লাগে না। যে বিষয়টি পড়তে তোমাদের মজা লাগে সেই বিষয়টি নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা খুব সংক্ষেপে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত শব্দ লেখো

সন্ধি	শুরু
ভুল	ছাড়ে
ছোট	চুপি-চুপি

পাঠ সম্বন্ধে দুটি কথা

তোমরা একটু লক্ষ্য করে দেখবে যে খেলা খেলতে আনন্দ পাও সেটি খুব তাড়াতাড়ি শিখে যাও বা যে কাজটি করতে খুব মজা লাগে সেইটি খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়। তেমনি পড়াটা যদি ভয় নয় আনন্দের সঙ্গে, মজার সঙ্গে করা যায় তবে খুব তাড়াতাড়ি মনও বসবে, মুখস্তও হবে।

ট্যাক্‌সো দিও হাতির

অধীর বিশ্বাস

ফুলস্পিডের জিপটা গ্যাঁক করে ব্রেক চাপতেই মানুষজন খই-ফোটার মতন ছিট্‌কে পড়ল রাস্তায়। বেচারা ড্রাইভারও টাল সামলাতে পারেনি। সামনের কাঁচ ফাটিয়ে মাথাটা জিপের সামনে বেরিয়ে গেল তার। তবু যে রক্ষে বিরাট কিছু অঘটন থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে ড্রাইভার।

জিপে ছিলেন সরকারি অফিসার। সঙ্গে কিছু লোক-লস্কর। কিছু খাবারদাবার, ফলমূল। শিলিগুড়ি শহর থেকে সরকারি বাংলো অনেক দূর। পাহাড় আর জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হয়। তাই বাজারহাট বেশিরভাগই আসে শহর থেকে। আর বাংলোয় ফিরতে গিয়েই আজ এই বিপত্তি। এই অফিসার আর সহকর্মী সবাই প্রায় নতুন। তাই এই অঞ্চল আর ফরেস্টের জীবজন্তু সম্পর্কে খুব একটা ধারনা নেই। তবু তো অফিসার। অফিসারের দাপটই আলাদা।

গাড়ির লোক যারাই থাক, যত বড় কর্তাই হোক তা কিন্তু মোহন হাতি আর তার দলবলের দেখার কথা নয়। গাড়ির শব্দ শুনেছে। বন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসেছে। এই শব্দ মানে মানুষজন পার হবে রাস্তা দিয়ে। সঙ্গে খাবারদাবার যাহোক তো কিছু থাকবে! মাহনের কথা-এই এলাকা দিয়ে সবাই আনন্দ করে খাবার নিয়ে চলে যাবে, অথচ বনের প্রাণীদের খাজনা দিয়ে যাবে না, তা কেন হবে? তাদেরও তো খিদে-তেষ্টা আছে। সুতরাং গাড়ির শব্দে এমন অ্যাটাক করা অন্যায় কিছু নয়। সে কিংবা তার সঙ্গী-সাথীরা তো কোনও মানুষ মারছে না! কিছু খাবার চাইছে। খাবার দাও, গাড়ি নিয়ে চলে যাও। কিছুকাল হল মোহন-হাতি, মোহন মোড়ল এমন রীতি চালু করেছে। তাতে অবশ্য হাতেনাতে ফল। পাহাড়ি আর জঙ্গল লাগোয়া মানুষজন জানে এই নিয়মের কথা। হঠাৎ হঠাৎ এমন অভিনব কায়দার আক্রমণে ওরা হাতির নাম দিয়েছে দস্যু হাতি। দস্যু মোহন।

মোহনের নির্দেশ অনুযায়ী মারুমহাতি ঠিক কাজেই করেছে। ঠিক মানে, গাছের গুঁড়িটা শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে এনে ফেলে দিল। ওতেই যা হবার হয়েছে। মোহন-হাতি শুঁড়

তুলে গোঙ্গানির মতন শব্দ করে নির্দেশ দিয়েছিল মারুম নামের এই কিশোর হাতিকে। মারুম আসলে এমন নির্দেশে অভ্যস্থ নয়। হুকুম পালন একটু দেরিতে হয়েছে। ভাগ্যিস শেষ মুহূর্তে ফেলেনি গুঁড়িটা। ফেললে জিপগাড়ি গুঁড়িয়ে যেত। মানুষজনের জান নিয়ে টানাটানি পড়ে যেত। কান্নাকাটি, রক্তারক্তি। সেই দৃশ্য কল্পনা করে বলা যায় মারুম আর ড্রাইভার বড্ড বাঁচান বাঁচিয়েছে। ড্রাইভারের অবশ্য কৃতিত্ব বেশি। আর, ক্ষয়ক্ষতি হলেও অতশত চিন্তা করে না মোহন-হাতি। মানুষরা কি তাদের কম ক্ষতি করেছে। বন কেটে দিচ্ছে। ফসল তুলে নিছে। তাদের কথা কেউ চিন্তা করছে না। দস্যু মোহন তাই দূরে দাঁড়িয়ে পরম নিশ্চিন্তে শুঁড় দুলিয়ে একটা গোটা বেল একবার মুখের মধ্যে পুরছিল আর একবার বের করছিল। সঙ্গী হাতিগুলো দুষ্টু জানোয়ারের মতন কুতকুতে চোখে মজা দেখছিল। মোহন শুঁড় উঁচিয়ে ডান পা তুলে উঁআউঁউঁ তুলেই হাটতে শুরু করে। হেঁটে আসছে গদাই লস্করি চালে ফরেস্ট্রের সামনে এই রাস্তামুখো। অন্যরা সারিবদ্ধভাবে পিছু পিছু। দলের মাঝে বাচ্চা শিমুইকে একেবারে ছোট্ট লাগছিল। সবার মাঝে ও এত আদরের যে মোহন মোড়লের এক সঙ্গী হাতি মাঝে মাঝেই শুঁড় লম্বা করে ভস্ ভস্ শ্বাস ফেলে ওর গায়ের ধুলোময়লা ঝেড়ে দিচ্ছিল। সেই আদর পেয়ে শিমুই ওর বিঘতখানের লেজটা দিয়ে নিজের গায়ে বাড়ি দিচ্ছিল। মোহন আবার হুঙ্কার দিয়ে দলবলসহ রাস্তায় পা দিল। দিয়ে, শুঁড় পেঁচিয়ে আহত মানুষজনদের কলাগাছ তোলার মতন এক এক করে জিপের মধ্যে তুলে দিল। এই সেবার কাজে অন্য হাতিরাও এগিয়ে এল। তারপর মোহন মুখের সে বেলটা পেঁচিয়ে এনে ওদের সামনে দোলাতে লাগল।

পড়ে কী বুঝলে?

1. খই ফোটার মতো কী ছিটকে পড়লো?
2. গাড়ির শব্দ শুনে হাতিরা কেন রাস্তায় চলে আসে?
   (ক) খাবারের জন্য (খ) মারবার জন্য
3. দস্যু হাতিটির কী নাম?

এই দৃশ্য এই অঞ্চলের মানুষের কাছে নতুন নয়। রাস্তার উপর জিপগাড়ি আর হাতির দঙ্গল দেখে একটা-দুটো মানুষ দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল। মোহন কিন্তু মাথা দুলিয়ে ডান পা তুলে শুঁড় দিয়ে বেলটা নাচিয়ে যায়। হাতির এই ভাষা সবাই কি চট্ করে বুঝতে পারে? অফিসার আর তার লোকজন ভাবছে, কী মতলব? বুদ্ধি করে তাদের

জিপে তুলে দিয়েছে ভাল-কথা। কিন্তু ওরা আর কী চায়? মোহন তো এর বেশি কিছু ইঙ্গিত দিতে পারে না। এই সাংকেতিক ভাষা যদি বুঝতে দেরি হয় তা হলে রাস্তার মাঝেই আটকে থাকো।

এতসব কান্ডকারখানা দেখে বুঝে দূরে দাঁড়িয়ে বুড়ো মতন মাথায় ঢোকা-দেওয়া লোকটা সাহস দেখিয়ে সামনে এল। এসে বলল, ''বাবুমশাইরা, হাতিরা খাবার চাইছে। খাবার দাও। পথ ছেড়ে দেবে।''

এমন কথায় কাজ হল। সরকারি অফিসার বেজায় রকমের আহত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গের লোকেদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'এই ভজা, ফলের ঝুড়ি হাতিদের সামনে নামিয়ে দে।'

কর্তা-সাহেবের হুকুম কি নড়চড় হয়? ভজা নামের লোকটা কোমর বেঁকাতে বেঁকাতে দারুণ ব্যথার শরীরটা কোনওরকমে টেনেটুনে অত্যন্ত ভক্তিভরে বড় রাস্তার উপর উপুড় করে দিল।

দলে কতগুলো হাতি এসেছে তা ঠিকমত গোনা যাচ্ছিল না। ওরা এত খুশি যে তা আর বলার কথা নয়। দলের মোড়ল মোহন কিন্তু এসব ফলের একটাও স্পর্শ করল না। সে মুখের বেলটা নিয়ে একবার এদিক একবার ওদিক করতে করতে ডান পা তুলে শুঁড় উঁচিয়ে উঁয়াউঁউঁ হুঙ্কার দিয়ে ওদের পথ ছেড়ে দিতে বলল। এবারকার এই ডাক, ডাকের এই সংকেত মারুম হাতির বুঝতে এতটুকু কষ্ট হল না। সে তার তাগড়াই শরীর নিয়ে অনায়াসেই গাছের গুঁড়ি সরিয়ে দিল। যেন ক্রিকেট জয়ের পর বিজয়ী ব্যাটটা বগলে তোলার মতন শুঁড়ে পেঁচিয়ে গুঁড়িটা তুলে রাস্তা দিল ফাঁকা করে। পড়ে রইল জিপ আর সামনে ফলের ঝুড়ি। বুড়ো মানুষটা খুশি মনে হেসে দিল। কী দারুণ বুদ্ধি। মোহন বনের সীমানায় দাঁড়িয়ে শুঁড় দোলাতে লাগল। ক্লিয়ার! ক্লিয়ার! গাড়ি ছেড়ে দাও।

দেবে কি! ড্রাইভারের কী দশা সেটা তো সকলের নজর এড়িয়ে গেছে। সত্যিই তো! গাড়ি ছাড়ছে না কেন? মোহন তো সিগনাল দিয়েই দিয়েছে। যেমন গাড়ি তেমন আছে। ড্রাইভারদাদা ঘুমিয়ে গেছে। কী হল, ড্রাইভারদাদা কাঁচের ভিতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে

আছে কেন? সত্যিই কি ঘুমিয়ে গেল? নাকি ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল লোকটা। – মোহন আবার জঙ্গল ছেড়ে রাস্তার দিকে এগোয়।

পড়ে কী বুঝলে?

1. অফিসার ভজ্জাকে কিসের ঝুড়ি নামিয়ে দিতে বললেন?
   (ক) ফলের ঝুড়ি (খ) আলুর ঝুড়ি
2. কোন হাতিটি গাছের গুঁড়িটা সরিয়ে রাস্তা ফাঁকা করে দিল?
3. মোহন হাতির মুখে আস্ত কী ফল ছিল?

এতক্ষণ বুঝতে পেরেছেন অফিসার, হাতি আসলে জানোয়ার হলেও জানোয়ার নয়। পেটে পেটে বুদ্ধি। আবার কী দাবি নিয়ে আসছে? নাকি..., সরকারি অফিসার তো ভয়েই জড়সড় নাকি ভয়ানক কিছু অন্যায় হয়েছে। অফিসার বিড়বিড় করে কী যেন মুখস্ত আউড়ে যান। ও বাবা, অন্যরাও দেখি ফল চিবুতে চিবুতে এদিকেই আসছে। সবারই এখন ঠক্ ঠক্ কাঁপুনি দশা।

কিন্তু না। সেসব কিছু নয়। দস্যু মোহন খুব শান্ত ধীরে জিপের সামনে এসে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে শুঁড় বাড়িয়ে ড্রাইভারদাদাকে কাঁচের কবল থেকে মুক্ত করে দিয়েই পা ফেলল থপ থপ।

জিপে ভটর ভটর আওয়াজ উঠল। জিপে হর্ণ বাজল। মোহন কিন্তু আর পিছন ফিরে তাকালো না। ও যা বোঝার বুঝে গেল। মুক্ত হল সরকারের জিপ। মুক্ত হয়েছে মানুষজন। গাছের পাখিরা ডেকে উঠল–কিক্ কিরিক্...।

সঙ্গী হাতিরা বনের মধ্যে হাঁটতে লাগল। ঘুরতে লাগল। তবে রাস্তার কাছাকাছিই। আবার কখন ডাক আসবে। মোহন হাতির ডাক ঃ উঁআউঁট্...তাহলেই বুঝতে হবে গাড়ি আসছে। খাবারের গাড়ি। মোহন সেই জায়গায় গাছপালা আর সবুজ পাতার সঙ্গে মিশে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা দোলায় আর শুঁড় নাচায়। মুখে তার আস্ত বিল্বফল।

"আসবে এস্-স্বাগতম্।
বনের পথে মোদের জন্যে
ট্যাক্সো এনো এইরকম।"

জেনে রাখো

ট্যাকসো	–	ইংরাজি শব্দ Tax যার অর্থ কর, খাজনা (গল্পে ট্যাক্স শব্দটি ট্যাকসো হয়েছে)
ফুলস্পিডে	–	তীব্র বেগে, খুব জোরে
ড্রাইভার	–	গাড়ির চালক
বাংলা	–	এক বিশেষ ধরনের বাড়ি
ফরেস্ট	–	জঙ্গল
লোক-লস্কর	–	লোকজন, দলবল
আক্রমণ	–	হামলা
হুঙ্কার	–	গর্জন করা
হুকুম	–	আদেশ
সারিবদ্ধভাবে	–	লাইন দিয়ে
মাথার টোকা	–	তালপাতা বা কঞ্চি দিয়ে তৈরি একপ্রকারের মাথার টুপি যেটা মাথায় দিয়ে চাষিরা কৃষিকাজ করে।
বিঘত খানেক	–	হাতের তালু প্রসারিত করলে বুড়ো আঙুলের মাথা থেকে কড়ে আংগুলের মাথা পর্যন্ত মাপ, আধ হাত মাপ।
বিল্বফল	–	বেল, এক প্রকার ফল

জেনে রাখো : পৃথিবীতে যত জীব-জন্তু, পশু-পাখি, গাছ-পালা আছে তাদের সবারই বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তবে ভেবে দেখো, যদি আমরা গাছ-পালা, জঙ্গল কেটে সব নষ্ট করে দিই তাহলে জঙ্গলের জীব-জন্তু কি ভাবে বেঁচে থাকবে? যদি ওরা না বেঁচে থাকে, তাহলে আমরাও কি নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করতে পারবো? বনের পশুরা বন ছেড়ে জনপদে এসে উৎপাত করছে। তাতে আমাদের বিপদ বাড়ছে। সুতরাং তাদের কথা আমাদেরও ভাবতে হবে।

তোমরা কী জানো হাতি আমাদের কত উপকারে লাগে? আমাদের দেশের বহু এলাকায়, বিশেষ করে মেঘালয়, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ এবং দক্ষিণ ভারতের বহু এলাকায় গেলে দেখতে পাবে হাতির সাহায্যে মোটা মোটা গাছের বড় বড় গুঁড়ি বা কাঠ টেনে গাড়িতে বোঝাই করা হচ্ছে। অনেক দুর্গম এলাকায় হাতিকে যাত্রী বহনের কাজে ব্যবহার করা হয়। অনেক শোভাযাত্রায় হাতিকে শোভা বাড়াতে দেখা যায়। পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্যও হাতিকে কাজে লাগানো হয়।

পাঠবোধ

1. ঠিক শব্দ দিয়ে খালি জায়গাগুলি ভরো।

   বাংলো, সহকর্মী, লস্কর, ক্ষতি, তেষ্টা

   ক. শিলিগুড়ি শহর থেকে সরকারি.....অনেক দূর।

   খ. অফিসার আর.....সবাই নতুন.

   গ. হাতিদেরও খিদে.....পায়।

   ঘ. মানুষরা কি কম.....করেছে।

   ঙ. হেঁটে আসছে গদাই.....চালে।

অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

2. বাচ্চা হাতির নাম কী?
3. হাতিরা মানুষজনদের কাছে কী চায়?
4. কে গাছের গুড়িটা রাস্তায় ফেলে দিল?
5. কে বলল? 'বাবু মশাই হাতিরা খাবার চায়'।
6. এতক্ষণে অফিসার বুঝতে পারলেন। কাদের পেটে পেটে বুদ্ধি আছে?

সংক্ষেপে উত্তর দাও

7. সরকারি অফিসার জিপে করে কোথায় যাচ্ছিলেন?
8. হাতিদের রাস্তা আটকানোর কথা ও এই নতুন রীতি সম্বন্ধে কাদের জানা ছিল না?
9. ধীরে-ধীরে কে এসে কাঁচের কবল থেকে কাকে মুক্ত করে দিলো?

10. শিমুই কে? ওকে দলের মাঝে কেমন লাগছিল?

11. অবশেষে মোড়ল হাতির মুখে বিল্বফল নিয়ে পাতার সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে কী ভাবছিল? বিস্তারিতভাবে লেখো

12. 'ট্যাকসো দিও হাতির' গল্পের মধ্যে হাতিদের খাবারের জন্য কী করা হলো? বর্ণনা করো।

13. খাবার পেয়ে হাতিরা লোকদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করলো?

14. সত্যিই হাতিদেরও দয়া-মায়া আছে কী ভাবে বোঝা গেল? বর্ণনা করো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত শব্দ লেখো

সামনে	দুষ্টু
সরকারী	দূরে
শহর	বাচ্চা
অন্যায়	এগিয়ে

2. শব্দগুলির বহুবচনের রূপ লেখো

হাতি	ঝুড়ি
গাছ	মোড়ল
শিশু	রাস্তা

3. শব্দগুলি দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করো যার শেষ অক্ষরে মিল আছে ।

যেমন : দোলনা, খেলনা

মমতা	রীতি
ময়লা	মাসি
জামাতা	অঞ্জনা
বাতাসা	মিল

দুপুরে গ্রামের পথ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুপুরে গ্রামের পথ ফুলে ফুলে ছাওয়া,
কানাকানি ক'রে যায় সুরতোলা হাওয়া।
যত দূরে হেঁটে যাই গাছে গাছে কারা
মধুর ছায়ার আড়ে রেখেছে পাহারা।
হেথাহোথা বাঁশবন ফিঙে ঝাঁকে ঝাঁকে
সারাদিন ডাক দেয় তোমাকে আমাকে।

সে ডাকে কে সাড়া দেয়, পাশের পুকুরে
বাঁশপাতা ঝরে শুধু কাছ থেকে দূরে।
কখনও আকাশ হাসে জলে মুখ দেখে,

দুটি হাঁস জলে নামে পানাতে গা ঢেকে।
আর সব চুপচাপ, ফিসফাস হাওয়া
পা টিপে পা টিপে পথে করে আসা যাওয়া;
কে কোথায় ঘুম যায়, বুঝি তারই তরে।
আগে কি জানি সে আমি ঘরেরই ভিতরে।

জেনে রাখো

কানাকানি	–	কানে কানে কথা বলা
আড়ে	–	আড়ালে
হেথা হোথা	–	(কবিতার ভাষা) এখানে ওখানে
পানা	–	কচুরি পানা – এক রকমের লতা গাছ যা জলে জন্মায়, খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে।
ফিসফাস	–	খুব আস্তে আস্তে
তরে	–	(কবিতার ভাষা) জন্যে

কাব্য পরিচয়

নির্জন দুপুরে গ্রামের পথে ফুলের শোভা। মৃদু হাওয়ায় সুরের ছোঁয়া। ছায়ার আড়াল থেকে গাছেদের পাহারা। বাঁশ বনে পাখির কাকলিতে শোনা যায় সকলের জন্য আহ্বান। পাশের পুকুরে বাঁশপাতা ঝরে পড়ে। পুকুরের জলে আকাশের উজ্জ্বল ছায়া। সেখানে কচুরি পানায় শরীর ঢেকে হাঁসেদের খেলা চলে। সব কিছুই হয় চুপিসাড়ে। হাওয়া যেন সেখানে সাবধানে পা ফেলে যাওয়া আসা করে; কারণ নিঃস্তব্ধ দুপুরে কে বা কোথায় ঘুমিয়ে থাকে। সেই সময়ে বাইরের প্রকৃতি ছুঁয়ে যায় কবির হৃদয় মনকে।

পাঠবোধ

বাঁ দিকের অংশটির সঙ্গে ডানদিকের অংশটি ঠিকভাবে মিলিয়ে লেখো

বাঁ দিক	ডান দিক
ক. কানাকানি করে যায়	ক. ফিসফাস হাওয়া
খ. হেথাহোথা বাঁশ বন	খ. বুঝি তারই তরে
গ. বাঁশপাতা ঝরে শুধু	গ. ফিঙে ঝাঁকে ঝাঁকে
ঘ. আর সব চুপচাপ	ঘ. কাছ থেকে দূরে
ঙ. কে কোথায় ঘুম যায়	ঙ. সুর তোলা হাওয়া

2. খালি জায়গাগুলি ঠিক শব্দ দিয়ে ভরো –

   দুপুরে গ্রামের..... ফুলে ফুলে ছাওয়া

   ক. পথ　　খ. ঘাট

   গ. ঘর　　ঘ. গাছ

3. .....ছায়ার আড়ে রেখেছে পাহারা

   ক. কোমল　　খ. মধুর

   গ. নরম　　ঘ. শীতল

4. .....ঝরে শুধু কাছ থেকে দূরে

   ক. ঝাউপাতা　　খ. আমপাতা

   গ. বাঁশপাতা　　ঘ. নিমপাতা

5. কখনও.....হাসে জলে মুখ দেখে

   ক. বাতাস　　খ. চাঁদ

   গ. বাদল　　গ. আকাশ

সংক্ষেপে লেখো

6. দুপুরে কোন পথ ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়? সেখানে কেমন হাওয়া কানাকানি করে?
7. পানাতে ঢেকে কারা জলে নামে?
8. ফিঙেরা ঝাঁকে ঝাঁকে কোথায় আসে? তারা সারাদিন কাকে ডাকে?

বিস্তারিতভাবে লেখো

9. দুপুরে গ্রামের পথের যে রূপের কথা কবিতায় বলা হয়েছে, তা নিজের ভাষায় লেখো।
10. নির্জন দুপুরে গ্রামের পুকুরের বর্ণনা কবি যেভাবে দিয়েছেন, সহজ কথায় তা বুঝিয়ে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. অনেক সময় কবিতা-গল্পে জোড়া শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, গলাগলি, হাতাহাতি, ধুপধাপ ইত্যাদি। 'দুপুরে গ্রামের পথ' কবিতায় এরকম শব্দ আছে। সেই শব্দগুলি খুঁজে বের করে লেখো।

2. নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য তৈরি করো

গ্রাম	দূরে
দুপুরে	পাহারা
হাওয়া	সারাদিন

3. বানানগুলি ঠিক করে লেখো –

বাস পাতা	দুপুর
পূকুর	হাস
আকাস	মধূর

4. তোমার ছুটির দিনের একটি দুপুরের কথা নিজের মতো করে বন্ধুর কাছে চিঠিতে লিখে জানাও।

করতে পারো

তোমরা অনেকেই হয়তো গ্রাম দেখেছ। তোমার দেখা কোন গ্রামের বাড়ি ঘর, গাছপালা, নদী ইত্যাদির ছবি আঁকতে পারো।

বিচার

মোহিত রায়

তেজি ঘোড়া ছুটে চলেছে তীর বেগে। লাগাম ধরে আছেন পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ (1780–1839 খ্রীঃ)। তিনি চলেছেন মৃগয়ায় ঘন বনের দিকে। একা নয়–কত পাইক বরকন্দাজ তাঁর পিছনে সারি সারি ঘোড়ায় চড়ে চলেছে। নির্জন পথ।

এমন সময়ে পথের পাশের একটা কুল গাছের আড়াল থেকে একটা পাথর এসে লাগল রণজিৎ সিংহের মাথায়। কেটে গেল কপাল। দর দর করে ঝরতে লাগল রক্ত।

কে মারল এই পাথর? সাহস তো কম নয়। রাজার গায়ে হাত। শেষে কুল গাছের কাছে এক বুড়ি ছাড়া কাউকে পাওয়া গেল না। শেষে বুড়িকেই ধরে আনা হল।

বিচার সভা বসল পরদিন।

বুড়িকে হাজির করা হল। কাঁপছে বুড়ি ঠক্ ঠক্ করে। পরণে ময়লা ছেঁড়া তালি দেওয়া থান। চোখ দুটো যেন গর্তের ভিতর চলে গেছে – চোখে ভাল দেখতেও পায় না। মুখের

চামড়া কুঁচকে গেছে।

রণজিৎ সিংহ বুড়িকে বললেন ঃ তুমি পাথর ছুঁড়েছ?

বুড়ি মাথা নিচু করে নিচু গলায় বলল ঃ হ্যাঁ।

রণজিৎ সিংহ তখন বললেন ঃ কেন পাথর ছুঁড়েছো?

বুড়ি ধীরে জবাব দেয় ঃ মহারাজ, আমি আপনাকে ছুঁড়িনি।

আমি কুল গাছে পাথর ছুঁড়েছি – কুল পাড়ার জন্যে। আমার ছেলেটা কাল থেকে কিছু খায়নি – কুল পেড়ে নিয়ে গিয়ে তাকে খাওয়াতাম। কিন্তু তা আর হল না– বুড়ি কাঁদতে থাকে।

করুণ দৃশ্য । সভার সকলে চুপ, কারও মুখে কোন কথা নেই। সকলে ভাবতে থাকে। এমন সময় সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন রণজিৎ সিংহ। তিনি রায় দিলেন ঃ বুড়ি নির্দোষ – নিরপরাধ।

খাজাঞ্চিকে আদেশ দিলেন রণজিৎ সিংহ ঃ এখনই বুড়িকে হাজার মোহর দাও আমার তহবিল থেকে। সভাসদেরা বলে উঠলেন ঃ মহারাজ, পাথর ছুঁড়ে বুড়ি আপনার রক্তপাত ঘটিয়েছে – তাই আইনের চোখে বুড়ি দোষী, অপরাধী – আর এই দোষে অপরাধের দণ্ড মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নয়।

রণজিৎ সিংহ হাসলেন। তার পর বললেন ঃ বনের কুল গাছকে পাথর দিয়ে আঘাত করলে সে কুল দেয় – অনাহারীর আহার। আর আমি এই গোটা রাজ্যের রাজা হয়ে তার থেকে বেশি কিছু কি দিতে পারি না? এ ছাড়া, যে রাজ্যের মানুষ অনাহারে থেকে বনের কুল খেয়ে পেট ভরায় তার ক্ষিদের জন্য যে রাজ্যে রক্তপাত হয় – সে রাজ্যের সব দোষ আর অপরাধের জন্য দায়ী রাজা ছাড়া আর কেউ নয়। তাই দণ্ড তো আমার নিজেরই প্রাপ্য। রণজিৎ সিংহের কথা শুনে সকলে নির্বাক হয়ে যায়।

জেনে রাখো

কেশরী	–	কেশর যার আছে অর্থাৎ সিংহ, শ্রেষ্ঠ, প্রধান।
লাগাম	–	ঘোড়ার মুখে লাগানো দড়ি

মৃগয়া	–	শিকার
পাইক	–	পদাতিক সৈনিক, লাঠিয়াল
বরকনন্দাজ	–	বন্দুকদারী সেপাই
থান কাপড়	–	পাড় নেই এমন কাপড়
খাজাঞ্চি	–	ধন রক্ষক
অনাহারী	–	উপবাসী
তহবিল	–	ধন–ভান্ডার, কোষ
নির্বাক	–	চুপ

পাঠ পরিচয়

এক রাজা ও এক অসহায় গরীব প্রজার গল্প। গল্পটিতে অনাহারে থাকা ছেলের জন্য কুল পাড়তে গিয়ে বুড়ির ছোঁড়া পাথরে রাজার আঘাত লাগে। আইনের চোখে বুড়ি দোষী হলেও মানবিকতার দিক দিয়ে রাজা বেশি দোষী কারণ – তার রাজ্যের প্রজা অনাহারে আছে। বিচারকের কাছে ধনী দরিদ্র সবাই সমান। বিচারক এখানে স্বয়ং রাজা, তাই রাজা বুড়িকে কেবল নির্দোষ বলেননি তাকে অর্থ সাহায্যও করলেন।

পাঠবোধ

1. "যে রাজ্যের মানুষ অনাহারে থেকে বনের কুল খেয়ে পেট ভরায় তার ক্ষিদের জন্য যে রাজ্যে রক্তপাত হয় সে রাজ্যের সব দোষ আর অপরাধের জন্য দায়ি রাজা ছাড়া আর কেউ নয়। তাই দন্ডতো আমার নিজেরই প্রাপ্য।"

উপরের অংশটি পড়ে নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও

ক. উপরের কথাগুলি কার?

খ. রাজ্যের মানুষ কী খেয়ে পেট ভরাতো?

গ. রাজ্যের সব দোষ আর অপরাধের জন্য রাজা কাকে দায়ি মনে করেছেন?

ঘ. দন্ড কার প্রাপ্য?

সংক্ষেপে উত্তর দাও

2. রণজিৎ সিংহ কে ছিলেন?
3. রাজা ঘন বনের দিকে যাচ্ছিলেন কেন?
4. রণজিৎ সিংহকে কে পাথর মেরেছিল?
5. বুড়ি কেন পাথর ছুঁড়েছিল?
6. বুড়ি কী জন্য কুল পাড়ছিল?
7. বিচারে রাজা কী রায় দিলেন?
8. খাজাঞ্চিকে রাজা কী আদেশ দিলেনয

বিস্তারিতভাবে উত্তর দাও

9. রাজা কেন নিজেকে অপরাধী মনে করলেন?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. লিঙ্গ পরিবর্তন করো।

রাজা	রাজপুত্র
সিংহ	রাজকুমার

2. বিশেষণ শব্দগুলি পাশে লেখো

তেজি ঘোড়া	ময়লা কাপড়
করুণ দৃশ্য	পাকা কুল

দেয়াল–পত্রিকা

দেয়াল – পত্রিকা একটি নমুনা দেওয়া হ'ল। এই পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য কয়েকজন বিদ্যার্থী নিয়ে একটি সম্পাদক মণ্ডলী গড়া যেতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে লেখা ও আঁকা সেগমরহ, পত্রিকাটির অলঙ্করণ, হাতে লেখা প্রভৃতি হবে সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যদের কাজ। পত্রিকাটি পাক্ষিক (অর্থাৎ পনেরো দিন বাদ) অথবা মাসিক হতে পারে। সব কাজে শিক্ষখ মহাশয়ের নির্দেশ এবং পরিচালনা অবশ্যই প্রয়োজন।

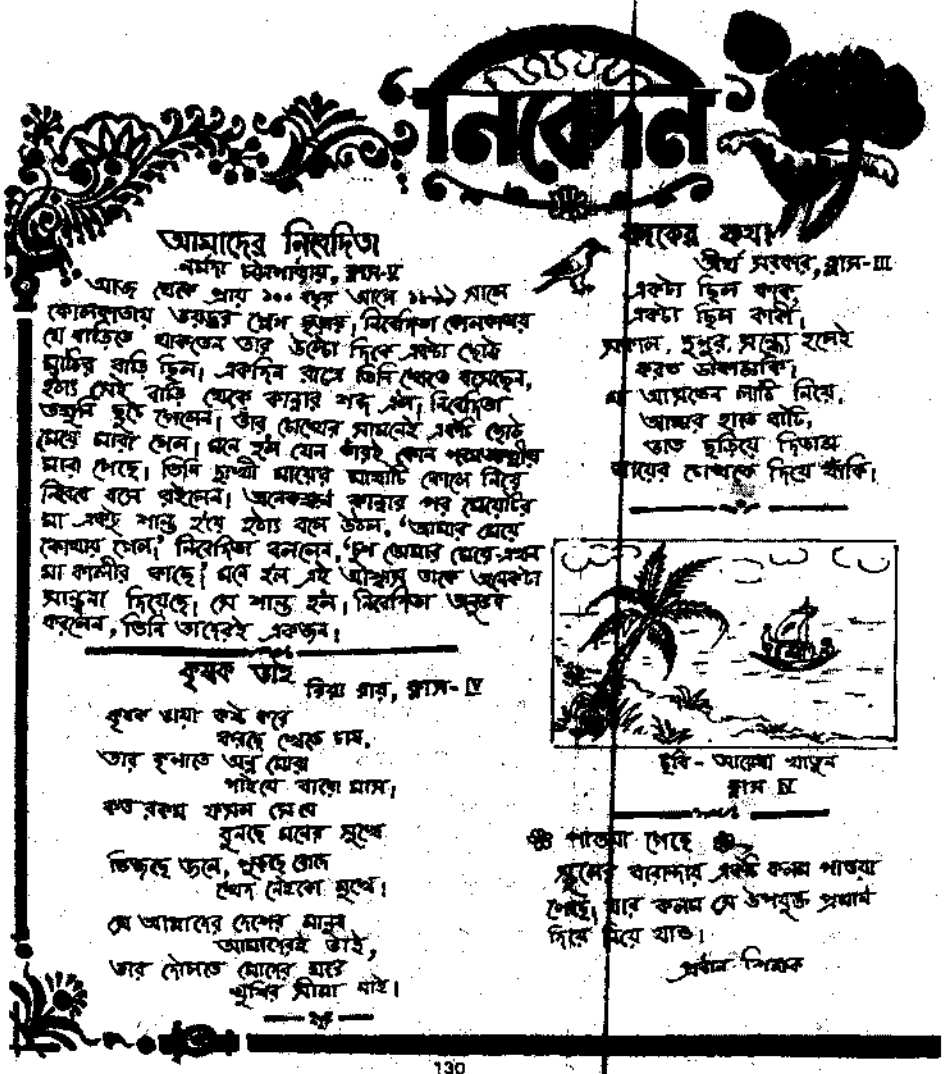

নিবেদিতা বিদ্যালয় পত্রিকা
১ম বর্ষ, ১-ম সংখ্যা ২০০১

সত্যি বাঘের সঙ্গে খেলা

সাবর্ণ দাস, ক্লাস II

সকালবেলা বাঘের বাচ্চাটা ঘাসের মধ্যে খেলা করছিল। আমার হাতে একটা লাল বল ছিল। আমারও খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওর সঙ্গে খেলা করি, কোলে নিয়ে আদর করি। তাই বলটা নিয়ে ওর কাছে গেলাম, কী খুশি! লাল বল দেখে তাড়াতাড়ি আমার কাছে এগিয়ে এল। বলটা সামনে ধরলাম, শুঁকলো। আমি বেশ আঙুল দিয়ে ছোঁব ভাবছি ও মা কোথা থেকে হালুম করে মস্ত বড় বাঘ আমার সামনে লাফিয়ে পড়ল। আমি তো উল্টে পড়েই গেলাম, ভয়ে চোখ বন্ধ আমার, কোনরকমে শুয়ে শুয়েই আড় চোখে তাকিয়ে দেখি মা বাঘ তার সামনের থাবা দিয়ে বাচ্চাটাকে কোলে টেনে নিল, আমি গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। বাঘ আমার ঘাড় মটকাতে পারেনি, আর মটকাবেই বা কী করে? ওটা চিড়িয়াখানা ছিল যে।

বিদ্যালয় সংবাদ

গত ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে স্কুলে একটি সুন্দর অনুষ্ঠান হয়। বাইরের বহু অতিথি এসেছিলেন।

এবছর গরমের ছুটির আগে স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হবে। এই উপলক্ষে নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তি ইত্যাদি হবে। যারা অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তারা বর্গ শিক্ষকের কাছে নাম লেখাও।

— • —

এবছর প্রথম আমাদের স্কুলে 'নিবেদন' দেওয়াল পত্রিকাটি প্রকাশিত হল। আশা করি পত্রিকাটি সবার ভালো লাগবে। বর্তমানে পত্রিকাটি মাসিক পত্রিকাই থাকবে, ভবিষ্যতে পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক হতে পারে।

আগামী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য লেখা অনুগ্রহ সাতদিন আগে সম্পাদকের কাছে জমা দাও।

সম্পাদনায় - পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়,
বীথিকা সরকার,
ছবি এঁকে সাজিয়েছেন - শুভেন্দু বিশ্বাস।